যেতে যেতে পথে পথে

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

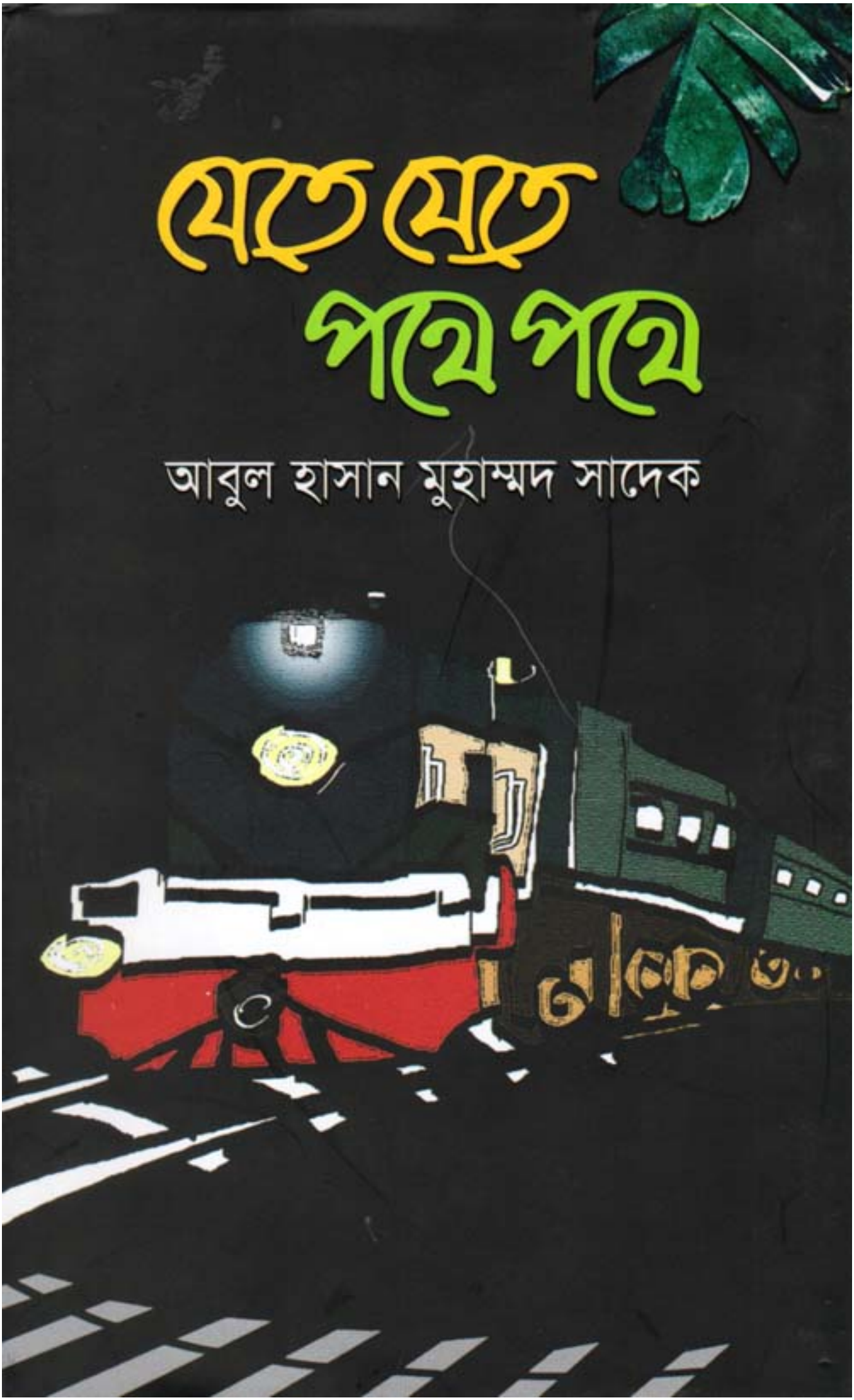

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ১৯৫৩ সালের ১ মে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পীরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল খালেক বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও মুক্তধারার চিন্তাবিদ ছিলেন এবং মাতা আয়েশা খাতুন প্রখ্যাত সমাজ সেবিকা ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষকের চাকরি নিয়ে শিক্ষকতা জীবন শুরু করে একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক, এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। অতঃপর মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ সময় কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন অধ্যাপক, ডীন ও সিনেট সদস্য হিসেবে।

তিনি বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা, এবং বর্তমানে এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে-ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার ইন এডুকেশন ২০০০-২০০১; জার্নালিস্ট সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ওয়েলফেয়ার ২০০৫; কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শিক্ষা পুরস্কার ২০০৮; স্বাধীনতা সংসদ পদক (শিক্ষা) ২০০৯; মাদার তেরেসা স্বর্ণ পদক ২০০৯; ভিন্নমাত্রা এ্যাওয়ার্ড ২০১১; স্যার সুবাসচন্দ্র বসু এ্যাওয়ার্ড ২০১১ এবং রয়েল একাডেমি এ্যাওয়ার্ড, জর্ডান, ২০১৬। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য Bangladesh Education Leadership Award ২০১৭ লাভ করেন। এ ছাড়াও শিক্ষা ও গবেষণার জন্য Education Watch Honorary Award 2017 লাভ করেন। বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য তিনি। তিনি রোটারি ক্লাব অব ঢাকা স্কলার্স-এর চার্টার প্রেসিডেন্ট (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি)। মানব সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে পল হ্যারিস ফেলো এবং রোটারীর সর্বোচ্চ সম্মাননা AKS হিসেবে ভূষিত করা হয়।

তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: বাজু কুরুং (ছোটগল্প); ফিরে চাই অরণ্য (কাব্যগ্রন্থ); ক্লোনিং (কাব্যগ্রন্থ); ডালি (কাব্যগ্রন্থ) চেতনায় বায়ান্ন (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ) ও চেতনায় বিজয় (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ); ফেরাউনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); মৃত সাগরের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)। শিশুতোষ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হলো- দাদুর আড্ডায় নজরুল; এই আমার বাংলাদেশ; আমিও উড়তে চাই; তুমিও করতে পারো; জুঁই ও তোতা পাখি; আমি সভাপতি শিয়াল বলছি; ছড়ার আসর; আমি যদি পাখি হতাম; দেশটাকে গড়বো; আসমার ঈদের জামা ইত্যাদি।

এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকে তাঁর গল্প, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নিয়মিত। দেশে ও বিদেশে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

যেতে যেতে পথে পথে

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

যেতে যেতে পথে পথে

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
কথামালা

প্রকাশক

কথামালা

বাড়ি ১৪, রোড ২৮, সেক্টর ৭

উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

ফোন : ০১৬৭৮৬৬৪৪০১

email : kothamalaprokashani@gmail.com

website: www.aub.edu.bd/home/kothamala

www.aub.edu.bd/home/kothamala-publications

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ ইউছুফ

পরিবেশক

নোলক প্রকাশন, ৫১ মধ্য পাইক পাড়া, মিরপুর।

চলন্তিকা, ১১/৬ (রওশন হেরিটেজ) ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কাঠাল বাগান, ঢাকা।

পাতা, ৯৬ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

বাকচর্চা, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা।

অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com, rupantarbd.com

মূল্য : ১৭০.০০

Jete Jete Pathe Pathe by Abul Hasan M. Sadeq,
First Edition: February 2019, Published by Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230
Phone- 01678664401
Price : Tk. 170.00
ISBN : 978-984-92519-6-5

কিছু কথা

জীবনে চলার পথে অনেক কিছু হয়। ঘটে অনেক কিছুই। কিছু মনে থাকে, কিছু থাকে না। কিছু নিয়ে রচিত হয় গল্প, কবিতা আরো কতো কিছু। আবার অনেক কিছু নিয়ে কিছুই হয় না। কালের স্রোতে হারিয়ে যায়। চলার পথের এসব টুকরো কথা ও টুকরো কাহিনী ধরে রাখলে কিছু মন্দ হয় না। কলমের দু'এক খোঁচায় তার কিছু কিছু ধরে রাখা যায়। এতে হারানো মাণিকও থাকতে পারে। তা যদি নাও হয়, কিছু না কিছু তো থেকেই যাবে। তা ভেবে এখানে খচিত হলো কিছু কথা, কিছু কাহিনী।

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
আমি ভালো আছি	৭
বিয়ে করলে ভালোই হতো	৮
জন জানডাই	৯
সন্তান অনুসন্ধান সমিতি	১১
বান্ধবী	১২
মাতৃভাষা	১৩
নিক আজিজ	১৪
এই সমাজে মেয়েকে	১৫
আরেক বছর থেকে যাই	১৬
যোগ্যতাই হুমকি	১৭
কারো জন্য অপেক্ষা করছি	১৮
সাংঘর্ষিক ঐক্য	১৯
বিদেশিনীর সাথে বিয়ে	২০
আইডিত গাজালী	২১
অক্ষয় কুমার রায়	২২
বাসায় না এসে যেতে পারবেন না	২৩
নারী হলো পাহাড়ের মতো	২৪
গাড়ির দেশে গাড়ি নেই	২৫
বাইকি	২৬
প্রায়শ্চিত্ত	২৭
লেখালেখি	২৮
রাতের আমন্ত্রণ	২৯
হিরোশিমা	৩০
প্রকৃতির পরিবর্তন	৩১
স্মরণীয় ক্লাশ	৩২
নেশা	৩৩
যমযম	৩৪
বন্দাই বীচ	৩৫
আপনাকে দেখতে এসেছি	৩৬
কাশগড়ি	৩৭
নাজিব	৩৮
শৈল্পিক ভূষণ	৩৯
মুশুরি	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বাস খালি	৪১
ক্ষমতার মোহে ক্ষমতা শেষ	৪২
বারান্দা ফ্রিজ	৪৪
প্রতিপক্ষের হাত ধরে ক্ষমতায়	৪৫
রং মহল	৪৬
দুই প্রগতিশীল বন্ধু	৪৭
কুকুর জীবন	৪৮
বিদেশী বউ	৪৯
সম্মতি থাকলে অসুবিধা কি	৫০
ভাসমান বাজার	৫১
হারানো ফোন	৫২
নুরান সিস্টার্স	৫৩
বিশ থেকে দুই	৫৪
মাথায় বিদেশের কিড়া	৫৫
আব্বু তুমি আর মদ খেয়ো না	৫৬
কান্নাপার্টি	৫৭
ড্রাইভারের বাসায়	৫৮
লিচুর জুস	৫৯
চাকরানী বউ	৬০
রাতে যদি চাও	৬১
জুতো চুরি পার্টি	৬২
বড় মনের কৃষক	৬৩
ফেসবুক	৬৪
তারা মিয়া	৬৫
চীনা কৌশল	৬৬
নিজেকে বিয়ে	৬৭
দুনিয়া	৬৮
আনন্দ দেয়ার আনন্দ	৬৯
বাবাই	৭০
ককপিট	৭১
সুন্দরী বউ	৭২
ব্যাংক ব্যালেন্স	৭৩
প্রধান অতিথি	৭৪
মা ও বউ	৭৫
পর্যটকদের সাথে কিছুক্ষণ	৭৬
আগের স্যার গরু	৭৭
পণ্য বিক্রয়ের মজার কৌশল	৭৮
টাকা জলে ঢালা	৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
বয়স আঠারো	৮০
হাতি	৮১
পাই বলেই আসি	৮২
চা-টা	৮৩
পীর মুরিদি	৮৪
মাইকেল জ্যাকশন নাচ	৮৫
তিন প্রজন্ম	৮৬
দাবি	৮৭
কি করে একটা সন্তান পাওয়া যায়	৮৮
ছাই লাগে ছাই	৮৯
ভিক্ষা ব্যবসা	৯০
ছাগল বানিয়ে ছাড়লো	৯১
বড় হতে চাই না	৯২
হিংসায় পতন	৯৩
মাজার	৯৪
কোক	৯৫
একটা শেষ করে নেই	৯৬
জীবনের ট্রেন একটাই	৯৭
কী লাভ এতো কিছু করে	৯৮
শিক্ষকতার আনন্দ	৯৯
ইচ্ছে শক্তি	১০০
গরু বানিয়ে ছাড়লেন	১০১
মতি মসজিদ	১০২
মনে ধনী	১০৩
প্রেম	১০৪
শশুর বাড়ি	১০৫
দাদা	১০৬
ইতি	১০৭
ট্রাফিক লাইটের ফুল	১০৮
বান্ধবীর সাথে রাত	১০৯
ওয়াদি জিন	১১০
ছোট্ট মেয়ের প্রজেক্ট	১১১
কাসাব্লাঙ্কা	১১২
উপপত্নী	১১৩
বিয়ে বার্ষিকী	১১৪
সাদা বউ	১১৫

আমি ভালো আছি

উইনিপেগে শীতকাল। তাপমাত্রা মাইনাস টুয়েন্টি। তুলোর মতো বরফ পড়ছে। সারা রাতের বরফ যেনো আকাশের মেঘের মতো জমে আছে সর্বত্র। সকালে উঠেই রাস্তার বরফ সরানো হয়। নয়তো গাড়ি চলতে পারে না।

আমার বাসার পাশে হাঁটার দূরত্বে শপিং সেন্টার। কেনাকাটা শেষে রাস্তা পার হচ্ছি। এক অশতিপর বৃদ্ধ ব্যাগ হাতে বরফের পিচ্ছিল পথ পেরোচ্ছিল আমারই সাথে। হঠাৎ পিছলে পড়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

হাত ধরে তাকে তুলতেই সজল নয়নে করুণ কণ্ঠে বললো, তুমি কে বাবা?

বললাম, এই বয়সে তুমি শপিং করছো, তোমার কেউ নেই?

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, ওল্ড ফোকস্ হোমে থাকি। খাওয়া দাওয়া পাই। অন্য কিছুর জন্য আমি নিজেই আসি।

বললাম, ছেলে মেয়ে স্ত্রী নেই?

বললো, ছেলে তো উঠতি বয়সেই গার্লফেন্ড নিয়ে চলে গেছে। প্রথম দিকে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো, পরে কখনো কখনো কার্ড পাঠাতো। এখন আর পাঠায় না। এক মেয়ে। সে ফাদার্স ডে-তে শেষ কার্ড পাঠায় দুবছর আগে। এখন ওরা কোথায় জানিনা। আমি এখানে ভালোই আছি।

বিয়ে করলে ভালোই হতো

কানাডার এক ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে একটি মহিলা। সাথে দুটি শিশু সন্তান। আমাকে বিদেশী দেখে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি কোথায়?
বললাম, বাংলাদেশ।

কয়েক মিনিটে কিছু কথাবার্তা হলো। কথা প্রসঙ্গে তার শিশু সন্তানের পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।
সে বললো, আমি বিয়ে করিনি।

আমার কৌতূহলী চাহনী দেখে সে বললো, আমার বেশ কয়কজন বয়ফ্রেন্ড আছে। তাদের থেকেই সন্তান নিয়েছি। বিয়ে করে নানা বাধ্যবাধকতা ও ঝামেলায় যেতে চাইনি।
বললাম, তা হলে সন্তান নিয়ে নিশ্চয় ভালোই আছ।

সে বললো, হ্যাঁ, ভালোই বটে। তবে এই পুরো সংসারের ভার আমার উপর। আর ভালো লাগছে না। বিয়ে করে নিলে বরং ভালোই হতো।

জন জানডাই

পাঁচতারা হোটেলের লিফটে তার সাথে দেখা হলো। অতি সাধারণ তার পোশাক। ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় হলো।
সে বললো, আমি একজন কৃষক।

পরের দিন পাংকোর ডায়লগের একটি সামষ্টিক অধিবেশন। এটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। একই সাথে বিভিন্ন মিলনায়তনে বিভিন্ন সেশন চলে। কিন্তু এই সামষ্টিক সেশনটি সবচেয়ে বড় মিলনায়তনে হচ্ছে। মালয়েশিয়ার কেদাহ রাজ্যের রাজা ও মন্ত্রীসহ অনেকেই তাতে উপস্থিত। এই সম্মেলনের সকল সেশনের অংশ গ্রহণকারীরাই উপস্থিত। কারণ এই সময়টিতে অন্যান্য মিলনায়তন কোন সেশন হচ্ছে না।

বসে আছি সামনের সারিতে। ঘোষণা করা হলো এখনকার এই সেশনে রয়েছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর বক্তা হলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। নাম জন জানডাই। দেখলাম, ওপাশ থেকে সেই ব্যক্তিটি হেঁটে আসছেন, যিনি গতকাল লিফটে পরিচয় দিয়েছেন তিনি একজন কৃষক।

তিনি এসে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলেন। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা বললেন। তার বক্তব্যের সারমর্ম নিম্নরূপ:

তিনি থাইল্যান্ডের এক গ্রামের বাসিন্দা। পিতা শিক্ষিত হলেও গ্রামে কৃষিকাজ করে চলতেন। কিন্তু জন জানডাই শহরের চাকচিক্যপূর্ণ জীবন দ্বারা প্রভাবিত হন। প্রতিজ্ঞা করেন উচ্চশিক্ষিত হবেন এবং শহরে সুখের জীবন যাপন করবেন। সুতরাং উচ্চশিক্ষা নিলেন। ব্যাংকক শহরে চাকরি নিলেন। কিন্তু এক দুই বছর কেটে গেলেও দেখতে পেলেন সারাদিন কাজ করে ঘরে ফিরতে হয় সন্ধ্যায়। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে রাতে ঘুম। আবার সকালে দৌড়াতে হয় কাজে। যে ঘরে থাকেন তাও খুব একটা প্রশস্ত নয়। আসে পাশে ঘোরাফেরার জায়গাও নেই। খোলা বাতাসের মাঠ নেই। গাছপালা নেই।

তিনি আরো বলেন, আমি দেখতে পেলাম এটা তো বন্দি জীবন, টেনশনের জীবন, অশান্তির জীবন। এখানে সুখ নেই। আমি ভাবতে

লাগলাম কিভাবে সুখ ও শান্তি পেতে পারি। শেষ পর্যন্ত আমি ব্যাংককের সেই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে গেলাম। আমার পিতার নিকট থেকে পাওয়া এক একরের কিছু বেশি জমি ছিল আমার। সেগুলো চাষাবাদের ব্যবস্থা করলাম। দেখলাম, তাতে আমার খাবার দাবার হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের খরচ হয়ে যায়। সারাদিন কাজ করতে হয় না। বিকেলে আমার স্ত্রী এবং ছোট্ট সন্তান নিয়ে গ্রামীণ সবুজ মাঠে আনন্দে হাঁটতে পারি। টেনশন নেই। আমরা অত্যন্ত সুখে আছি।

পাংকোর ডায়লগের এই সেশনটির শিরোনাম ছিল হ্যাপিনেস বা সুখ।

সন্তান অনুসন্ধান সমিতি

তখন আমি ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবায় পিএইচ.ডি-এর ছাত্র। সকালে নাস্তা সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবো। এমন সময় কেউ দরজায় নক করলো। দরজা খুলে দেখি তিনজন নারী দাঁড়িয়ে। বললো, ভিতরে আসতে পারি? ভাবলাম, আমি একা, তিনজনকে কিভাবে সামলাবো! তবু ভদ্রতার খাতিরে বলতে হলো- অবশ্যই, আসুন। ঘরে বসিয়ে বললাম, চা দেবো? ড্রিংক? বললো- না, ধন্যবাদ। আমাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু ....।

এদেশে একা বসবাসকারী পুরুষের ঘরে কি কারণে নারী আসে, সে ব্যাপারে কিছু মজার গল্প শুনেছি। কৌতূহল হলো। ভয়ও হলো। ওরা তিনজন .....। আর আমি একা .....।

এরপর তাদের কথা শুরু হলো। বললো, আমরা বড় নিঃসঙ্গ। (মনে মনে ভাবলাম, আমি একা তিনজনকে কিভাবে সঙ্গ দেবো?) আমাদের সবার ছেলে মেয়ে আছে। কিন্তু তারা কোথায় জানি না। আঠারো বছর বয়স হলেই তারা বয়ফ্রেন্ড গার্লফেন্ড নিয়ে চলে গেছে। এই বয়সে আমরা একা, নিঃসঙ্গ। কাজেই আমরা একটি সমিতি গঠন করেছি। নাম 'সন্তান অনুসন্ধান সমিতি'। উদ্দেশ্য, চলে-যাওয়া ও হারানো সন্তানকে খুঁজে বের করা। হারানো মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা, যাতে পরিবার টিকে থাকে। মা-বাবার সম্মান প্রতিষ্ঠা করা।

আমি বললাম, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তো আলাদা। আমরা বিশ্বাস করি, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। চোখের কোঠরে জল।

ভাবলাম, অর্থৈনৈতিক উন্নয়ন ও মূল্যবোধ কি পরস্পর উল্টো চলে!

বান্ধবী

কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবায় আমি পিএইচ.ডি করছি। একই বছর আরো কয়েকজন বাঙালি ছাত্র সেখানে গেছেন পিএইচ.ডি করার জন্য। আমরা সবাই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তবু মাঝে মাঝে একত্রিত হই। গল্প গুজব হয়। আড্ডা হয়। খাওয়া দাওয়া হয়।

আমাদের সাথের একজন সঙ্গী ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি ম্যানিটোবা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই একজন সাদা বান্ধবী যোগাড় করেন অথবা পেয়ে যান। আমাদের আড্ডাগুলোতে তিনি সে বান্ধবীর হাত ধরেই আসেন। গোটা সময়টাই মোটামুটি হাত ধরেই বসেন। এ নিয়ে কেউ কেউ এই আড্ডার বাইরে তাকে একটু রসিকতা করে কথাও বলেন। তিনিও রসিকতা করে উত্তর দেন, মন প্রফুল্ল থাকলে কাজে মন বসে। কাজে গতি আসে।

আমি এক বছরে অর্থনীতিতে মাস্টার্স শেষ করলাম। এরপর চার বছরে পিএইচ.ডি শেষ করে দেশে ফিরলাম। দেশে ফেরার পর প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। তখনো আমাদের সে সঙ্গীটির পিএইচ.ডি শেষ হয়নি।

বান্ধবীর গতিতে তার তেমন গতি আসেনি।

মাতৃভাষা

ব্যাংকক শহরে রয়েছে গগণচুম্বী অট্টালিকার সমারোহ। এগুলো আবাসিক হোটেল। এতো গগণচুম্বী হোটেল সত্ত্বেও কোথাও ঠাঁই নাই। সবগুলোই মানুষে ভর্তি। ভাবছিলাম, এতো লোক এখানে কেন আসে। রাস্তায় হাঁটতে গেলেই এর জবাব পাওয়া যায়। সুন্দরী সুন্দরী যুবতী মেয়েগুলো আকর্ষণীয় পোশাক ও দেহে আহ্বান জানাচ্ছে। ডাকছে ভিনদেশী পুরুষকে। এই ডাকে সাড়া দিতে জগতের প্রায় সব দেশ থেকেই ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ছুটে আসে এখানে।

কিন্তু একি! হোটেলের কাউন্টারে গেলে ইংরেজি ভাষায় বা বিদেশী কোন ভাষায় গ্রাহককে স্বাগত জানানো হয় না। একটি মেয়ে হয়তো হাসি মুখে এগিয়ে আসবে, বলবে 'ক্ষপ ক্ষুন ক্ষা'। এটাই থাই ভাষায় স্বাগত জানাবার উপায়। আর যদি কোন পুরুষ এসে স্বাগত জানায় তা হলে বলে, 'ক্ষপ ক্ষুন ক্ষাপ'। নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাগত জানাবার পার্থক্য হলো 'ক্ষা' ও 'ক্ষাপ'। আগন্তুক যে দেশেরই হোক, যে ভাষারই হোক বা যে রঙেরই হোক, তারা প্রথমে এই থাই ভাষায় স্বাগত জানাবে। অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করবে না। পরে অবশ্য ইংরেজি ব্যবহার করে। অনেক হোটেলে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

ভাবলাম, তারা তো তাদের ভাষার জন্য রক্ত দেয়নি। কেউ শহীদ হয়নি। মায়ের ভাষার প্রতি তাদের এমন ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি হলো!

নিক আজিজ

তেরোটি স্ট্যাট বা রাজ্য নিয়ে মালয়েশিয়া। প্রত্যেকটি রাজ্যে আছে মুখ্যমন্ত্রী এবং আইন পরিষদ। কেলানতান একটি রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিক আজিজ। একবার আমি রাষ্ট্রীয় সফরে কেলানতান গেছি। রাষ্ট্রীয় গাড়িতে ঘুরছি। একবার হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভার বললো, নিক আজিজের সাথে কি তোমার দেখা হয়েছে?
বললাম, না।

সে বললো, দেখা করতে চাও?
বললাম, চাই। কিন্তু তা কি করে হবে? আমার তো তার সাথে সাক্ষাতকার ঠিক করা হয়নি।

সে বললো, তুমি যদি চাও তা হলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।
বললাম, কিভাবে?
সে বললো, এখান থেকে কিছুটা দূরেই তার বাড়ি। আজ ছুটির দিন। সেখানে গেলেই তার সাথে দেখা হবে।

ভাবলাম, পাগল নাকি। একজন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কি এই ভাবে দেখা হতে পারে! তবু বললাম, যাও তো দেখি।
সে বললো, চলো তা হলে।

কিছু দূর গিয়ে দেখলাম একটা মসজিদ। তার পাশেই একটি বাড়ি। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে সে বাড়ির দরজায় নক করলো। একজন লোক বেরিয়ে এলেন। মনে হলো তিনি যেনো অজু করছিলেন। হাতটা ভেজা! কাপড় আগলে তিনি এসে দরজা খুলেছেন। আশ্চর্য হলাম! তিনিই নিক আজিজ!!

তাঁর বাড়ির কাছে কোন পুলিশ ছিল না। চৌকিদার ছিল না। তিনি নিজেই দরজা খুলেছেন। বললেন, আসরের সময় হয়ে গেছে। আমি কি অজুটা করে আসতে পারি? তিনি অজু করে বেরিয়ে এলেন। মসজিদে নামায হলো, তিনি ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। নামায শেষে পিছন ফিরে বসে গেলেন। লোকজনের সাথে কথাবার্তা হলো। অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি পরামর্শ দিলেন। তাদের পর আমি তাঁর সাথে বসলাম। আলাপ হলো হৃদ্যতার সাথে।

ভাবলাম, এই আধুনিক যুগেও যদি কেউ খলিফা ওমরের সাক্ষাৎ চায় তা হলে তার কেলানতান যাওয়া দরকার।

এই সমাজে মেয়েকে

আমি আর আমার স্ত্রী উইনিপেগের কেমার্ট নামক সুপার মার্কেটে গেছি। পণ্যের দাম দেওয়ার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছি। আমরা বাংলায় কথা বলছি। যখন কাউন্টারের মেয়েটির কাছে গেছি, তখন সে বাংলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কি বাঙালি?
বললাম, হ্যাঁ।

তার চেহারা এতো ফর্সা যে, ভাবতে পারিনি সে বাঙালি হবে। কলকাতার মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, কবে থেকে আছেন?

বললেন, অনেক বছর হয়ে গেছে। তবে, এখন চলে যাচ্ছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

বললেন, আমার এক মেয়ে আছে। তার বয়স সাত। এই সমাজে মেয়েকে বড় করতে চাই না।

আরেক বছর থেকে যাই

কানাডার উইনিপেগ শহর। সেখানে এক বাঙালি পরিবারের সাথে দেখা। ভদ্রলোক বড় ডাক্তার। বড় ক্লিনিকের মালিক। বাঙালি-অবাঙালি, সাদা-কালো সবাই তার ক্লিনিকে আসে। এক রাতদুপুরে সে ভদ্রলোক আমাকে ফোন করলেন। বললেন, আপনার সাথে কিছু কথা আছে। আমি কি আসতে পারি?

বললাম, এতো রাতে কেন কষ্ট করবেন? কাল না হয় আমি আপনার ওখানেই আসি, অথবা অন্য কোথাও মিলিত হই।

বললেন, না, আমি এখনই আসতে চাই।

এলেন। দরজা খুললাম। তার চোখে জল। বললেন, ক্লিনিকে অনেক রোগী ছিল, রোগী দেখতে দেখতে দেরী হলো। বাসায় ফিরলাম। আমার দুটি মেয়ে। যুবতী। তারা মদ খাচ্ছে। মদ খেতে আমি বারণ করলাম। তারা মদের বোতলটি আমার উপর ছুড়ে মারলো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

আমি সমবেদনা প্রকাশ করলাম। বললাম, আমি কি করতে পারি?

বললেন, আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনার সাথে কিছু শেয়ার করা যায়। হয়তো ভালো পরামর্শ পাওয়া যাবে।

অনেক কথা হলো, তিনি তাঁর জীবনের ইতিহাস বললেন। বললেন, এই দেশে লেখাপড়া করতে এসেছিলাম। লেখাপড়া শেষ করে রয়ে গেলাম। দুটি মেয়ে। ভাবছিলাম, মেয়ে দুটি বড় হওয়ার আগেই এই সমাজ থেকে চলে যাবো। কিন্তু প্রতি বছর মনে করি, আরেক বছর থেকে যাই। এই ভাবে অনেক দিন পেরিয়ে গেছে।

মেয়ে দুটি এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তাদের চাল চলন অন্য রকম। আমার কথা শোনে না। মায়ের কথা শোনে না। আমি একবার ভাবি, দেশে চলে যাবো। কিন্তু ওরা তো যাবে না। ওদেরকে রেখে আমি কিভাবে যাই! আগে যাইনি। এখন থাকতে চাইনা। যেতে চাই। কিন্তু যেতে পারি না।

যোগ্যতাই হুমকি

মালয়েশিয়ার কথা। এক সময় ড. মাহাথির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, আর আনোয়ার ইব্রাহীম ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। মাহাথির বয়োজ্যেষ্ঠ, আনোয়ার ইব্রাহীম বয়োকনিষ্ঠ। কিন্তু আনোয়ার ইব্রাহীমের জনসমর্থন এতো বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে ড. মাহাথির হুমকি মনে করলেন। ড. মাহাথির অত্যন্ত কৌশলী মানুষ। ঝানু রাজনীতিবিদ।

তিনি দেশপ্রেমিক শাসকের এক মূর্তপ্রতীক। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তিনি দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে তিনি একনায়কের মতোই দেশ চালিয়েছেন। যাকেই তাঁর নেতৃত্বের পথে বাধা মনে হয়েছে, তাঁকেই তিনি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। এক সময় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী গাফার বাবাকে তিনি ছুড়ে ফেলেন। কেউ মুখ খুলেনি, বা মুখ খুলতে পারেনি।

তবে আনোয়ার ইবরাহীমের ব্যাপারটি অন্যরকম। তাঁর জনপ্রিয়তাই কাল হয়েছে। তাঁকে বিনা কারণে এমনিতেই ছুড়ে ফেলা কঠিন হবে ভেবেই হয়তো তাঁকে একটি অপবাদের কৌশল খুঁজে নিতে হয়েছে। ফলে আনোয়ারকে জেল খাটতে হয়েছে দীর্ঘ সময়।

এ যেনো একের যোগ্যতা অন্যের জন্য হুমকি।

কারো জন্য অপেক্ষা করছি

ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার করিডোরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে প্রচণ্ড শীত। বরফ। একটি ছেলে ও মেয়ে এসে আরেকটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছো? মেয়েটি বললো, আজ থেকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুরু হচ্ছে। রাত কাটাবার জন্য কোন একজন সঙ্গীর খোঁজে আছি।

এটি হলো পশ্চিমা জীবন-ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য। ছেলে বা মেয়ের বয়স আঠারো বছর হলেই তারা পিতা মাতার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পিতামাতাও তাদেরকে আলাদা থাকার জন্য উৎসাহিত করে। কোন ছেলে হয়তো আরেকটি মেয়েকে নিয়ে এক সাথে বাস করে। আর কোন মেয়ে চলে যায় একটি ছেলের সাথে। তারা এক সাথে থাকে। কিন্তু যেহেতু তাদের মধ্যে বিয়ে বা অন্য কিছুর বন্ধন নেই তাই সামান্য কিছুতেই সেই সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে। তখন তারা খোঁজে বেড়ায় আরেকজনকে। এই অবস্থায় যখন তাদের কেউ থাকে না তখন সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে অথবা অন্য কোন সময় রাত কাটাতে কারো প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজন হলে প্রয়োজন মেটাতে হয়।

সাংঘর্ষিক ঐক্য

সিডনীতে ঘটা করে 'অস্ট্রেলিয়া দিবস' পালন করা হয়। আমি ক্যাম্পবেল টাউন সিটি কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে এসেছি। বড় মজার ব্যাপার দেখলাম এখানে কিছু, যা জীবনে কখনো কোথাও দেখিনি। অনুষ্ঠানের শুরুতে একই খুঁটিতে অস্ট্রেলিয়ার পতাকা ও আদিবাসীদের পতাকা। ইউরোপ থেকে আগত সাদা মানুষগুলো আদিবাসীদের দেশ দখল করে এবং স্বাধীন অস্ট্রেলিয়ার জন্য 'অস্ট্রেলিয়ান পতাকা' তৈরি করে। অপরদিকে আদিবাসীরা অস্ট্রেলিয়ার পতাকা প্রত্যাখ্যান করে নিজের 'আদিবাসী পতাকা' উত্তোলন করে। অথচ আজ অস্ট্রেলিয়া দিবসে দুটি বিপরীতধর্মী পতাকা উড়ছে একই খুঁটিতে। যেনো একই দেশে দুই পরস্পর বিরোধী পতাকা উড়লো একসাথে। একটি অস্ট্রেলিয়ান পতাকা, আরেকটা আদিবাসীদের পতাকা।

আরো মজা আছে। অস্ট্রেলিয়া দিবসের এ অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করেন একজন আদিবাসী নারী। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, এটি অস্ট্রেলিয়া দিবস নয়, বরং আধিপত্যবাদ দিবস। এটি আমাদের দেশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর চালানো হয়েছে হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন। কিন্তু এ কলঙ্কজনক ইতিহাস সত্ত্বেও চলুন আমরা হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাই।

এরপর একই মঞ্চে বক্তৃতা চললো আধিপত্যবাদী সাদা অস্ট্রেলিয়ানদের। অনুষ্ঠানে ছিলেন দুজন ফেডারেল মন্ত্রী, একজন স্টেট মন্ত্রী এবং মেয়র। অনেক কথার মাঝে তারা যে মেসেজ দিতে চেষ্টা করলেন তা হলো এই, আমরা ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারবো না। তবে ভবিষ্যতকে পরিবর্তন করতে পারি।

ভাবলাম, এতো ভিন্নমতের মানুষ এক মঞ্চে দাঁড়াবার এক বিরল উদাহরণ!

বিদেশিনীর সাথে বিয়ে

মালয়েশিয়ার এক ইউনিভার্সিটিতে আছি। শুনতে পেলাম, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বাঙালির সন্তান। একদিন তাকে পেয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, শুনেছি আমার পিতা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। তিনি তো মরে গেছেন। কাজেই এখানে বাংলাদেশর কেউ নেই, বাংলাদেশের কোন পরিচয় নেই। আর এই পরিচয় আমি দিতেও চাই না।

ভাবলাম, তার পিতা হয়তো উন্নত জীবনের জন্য বিদেশে এসেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন। হয়তো জীবন কাটিয়েছিলেন সুন্দরভাবেই। কিন্তু তার পরিচয় হারিয়েছেন। পৃথিবী থেকে তার নাম মুছে গেলো।

আইডিত গাজালী

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। এমনকি রাস্তার সুইপারদেরও দেখেছি, গাড়ি চালিয়ে আসে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে, আবার গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ফ্রিজ-টিভি তো মনে হয় সবারই আছে।

কুয়ালালামপুরের এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী আইডিত গাজালী। একদিন তাঁকে বাসে চড়ে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার, গাড়ি কোথায়?

প্রশ্ন শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। যখন আমি হাল ছাড়লাম না, তিনি মাথা নিচু করে বললেন, আমার এক বন্ধুর হঠাৎ অর্থের প্রয়োজন হয়েছিলো।

বললাম, অর্থের প্রয়োজনের সাথে গাড়ির কি সম্পর্ক?

মাথা নিচু করে তিনি বললেন, আমার হাতে নগদ অর্থ ছিল না, তাই গাড়িটা বিক্রয় করে অর্থ দিয়েছি।

আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলাম।

অক্ষয় কুমার রায়

আমাদের বাড়ি নরসিংদী জেলার পীরপুর গ্রামে। সে গ্রামে মুসলমানের সাথে ছিল অনেক হিন্দু। মিলেমিশে থাকতো সবাই। আমি তখন ছোট। সেখানে ছিল এক বড় হিন্দু পরিবার। তারা হয়তো জমিদারদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সেখানে থাকতেন অক্ষয় কুমার রায়। একটা সাদা ধবধবে ধূতি পরতেন। বিয়ে করেননি। আমি যখন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে স্কুলে যেতাম তখন আমাকে ডেকে নিতেন। চকলেট চানাচুর খেতে দিতেন। তার ঘরে কুরআন শরীফের একটা কপি ছিল। আমাকে ডেকে মাঝে মাঝে বলতেন, তুমি আমাকে একটু পড়ে শোনাও।

একদিন হঠাৎ দেখলাম তিনি নেই। স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে খুঁজলাম। পেলাম না। কেউ তার হদিস দিতে পারলো না। খুব খারাপ লাগলো। কয়েক সপ্তাহ পর একটা চিঠি পেলাম, পোস্টকার্ডে লেখা । নীচে স্বাক্ষর অক্ষয় কুমার রায়ের। তিনি লিখেছেন, তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন। আমার কথা তার মনে পড়ে। কিন্তু যাওয়ার সময় তিনি একটু আদর করে যেতে পারেননি বলে খুব খারাপ লাগছে তাঁর।

আমিও কান্না চেপে রাখতে পারিনি।

বাসায় না এসে যেতে পারবেন না

টোকিও'র একটি হোটেলে বসে আছি। তখন রাত। ফোন বেজে উঠলো। ধরলাম। অপর পক্ষ থেকে নারী কণ্ঠ। এই ধরনের বড় শহরগুলোতে হোটেলে যদি ফোন আসে এবং অপর পার থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে আসে তখন তার অনেক ধরনের কারণ থাকে। রোমান্টিক কারণও থাকে। ভাবলাম, ব্যাপার কি। কিন্তু অপর পার থেকে বাংলা ভাষায় একটি প্রশ্ন শুনতে পেলাম–স্যার, আপনি কি ড. সাদেক?

বললাম, হ্যাঁ।

তখন অপর পার থেকে বলা হলো, স্যার আপনি আমার বাসায় না এসে যেতে পারবেন না। আমি এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিলাম। এখন টোকিওতে কাজ করছি।

তার কথা শুনে ভালো লাগলো। যে দেশে যাই, কাউকে না কাউকে পেয়েই যাই, যার সাথে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির কোন না কোনোভাবে সম্পর্ক আছে।

নারী হলো পাহাড়ের মতো

এক সুখী পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান সে। তাকে অনেক আশা করে এবং ঘটা করে বিয়ে করানো হলো। ঘরে এলো নতুন বউ। সবার আদরের এই পুত্র সন্তান এবং তার নতুন বউকে নিয়ে পরিবারের কতো স্বপ্ন। সুখের স্বপ্ন, শান্তির স্বপ্ন।

একমাত্র পুত্রসন্তান ও তাঁর বউকে নিয়ে পিতামাতা থাকবে মহা আনন্দে। ছেলেকে ছেলের মতো এবং বউকে মেয়ের মতো আদর দেবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেই বউ তার স্বামীকে সফলভাবে বুঝাতে সক্ষম হলো যে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। পিতা মাতার বাড়িতে থাকলে হবে না। নিজের বাসা দরকার। কিছুদিন পর তারা অন্য আরেকটি বাসা করে সেখানে গিয়ে উঠলো।

এই কথাটি কানাকানি ও বলাবলি হতে লাগলো। একজন মহিলা বললেন, নারী হলো পাহাড়ের মতো। দূর থেকে দেখতে মনোরম। কিন্তু কাছে গেলে.....।

গাড়ির দেশে গাড়ি নেই

জাপানের টোকিও শহরে আছি। ভালো লাগছে। বড় বড় রাস্তা। কিন্তু যখনই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়, তখন মানুষকে দেখি পিপড়ের মতো হুড়মুড় করে সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে যায়। সেখানে ট্রেন ধরে। ট্রেনেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। আছে বুলেট ট্রেন। এই বুলেট ট্রেন এক শহর থেকে অন্য শহরে বুলেটের মতো দ্রুত চলে যায়। মনে হলো, এখানে এটাই যাতায়াতের প্রধান ও প্রথম মাধ্যম। আমি রাস্তার দিকে তাকালাম। সড়ক পথ অনেক প্রশস্ত ও পরিষ্কার। কিন্তু সেখানে গাড়ি খুবই কম।

বাংলাদেশে ট্রাফিক লাইটে গাড়ির ভিড় জমে। কখনো দেখা যায়, প্রায় আধা কিলোমিটারের মতো লম্বা লাইন লেগে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে। কিন্তু টোকিও শহরে ট্রাফিক লাইটে এসে বড় জোর তিন চারটা গাড়ি এসে থামলো। এ কেমন দেশ! গাড়ির দেশে গাড়ি নেই!

ভাবলাম, আমাদের এই ঢাকায় যদি পাতাল বা মেট্রো ট্রেনের ব্যবস্থা থাকতো, তা হলে হয়তো ট্রাফিক জ্যামে মানুষের এতো কষ্ট হতো না।

বাইকি

একদিন চলেছি অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে। শহরের রাস্তায় আলাদা আলাদা সুন্দর লেন আছে। অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সে রাস্তায় সব চলে। হঠাৎ একবার দেখতে পেলাম গোটা রাস্তা ভর্তি করে লাইন ধরে মটর সাইকেল নিয়ে এক দল লোক আসছে। তারা খুব দ্রুত যাচ্ছে না। যাচ্ছে ধীরে ধীরে, লাইন ধরে। তাদের প্রতি সমীহ প্রকাশ করে চারপাশে গাড়ি ও মানুষ পাশে দাড়িয়ে গেছে। তাদের রাস্তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাদের এতো দাপট, এতো মর্যাদা!

বলা হলো, এরা বাইকি।

বাইকিদের বিরাট দল আছে। তারা একসাথে চলাফেরা করে। বলা হয়, তারা 'বাইক লাভার', 'মোটর সাইকেল প্রেমিক'। তারা মটর বাইকে চলে। তারা এক সাথে দলে দলে চলে। দলছুট হলে তারা গুলি করে হত্যাও করতে পারে। হত্যা তাদের পানিভাত। পুলিশ তাদের কিছু বলতে পারে না।

তাদের দর্শন হলো এই যে, সমাজের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। যারা অন্যায় করে তাদেরকে হত্যা করবে, কোর্টে বিচারের প্রয়োজন নেই।

ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা।

প্রায়শ্চিত্ত

রমযানে মক্কা গিয়েছিলাম উমরাহ করতে। রমযানের উমরায় কাবা ঘরে মানুষের উপচে পড়া ভীড়। হোটেল ভাড়াও বহু গুণ বেড়ে যায়। সেখানে দেখা হলো এক বাঙালি ভদ্রলোকের সাথে। তার সাথে আগেও কিছুটা পরিচয় ছিল। তিনি এখন মক্কাতে বাড়ি ভাড়ার ব্যবসা করেন। পুরো দালান ভাড়া নেন রমযানে। এর পর ভাড়া দেয়া হয় এক একটা কক্ষ, এক একটা সিট। হজ্জের সময় আরো বেশি ব্যবসা হয়।

তিনি আমাকে সুন্দর করে বুঝালেন, আপনি যদি অল্প টাকা দিয়ে আমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন তা হলে প্রত্যেক বছর এ টাকার মুনাফা দিয়ে মক্কায় আসতে পারবেন। আসা যাওয়ার ভাড়া, থাকা খাওয়া সব কিছু হয়ে যাবে। সে বিনিয়োগের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার রিয়াল দিলেই হবে। মানুষকে ভালো করে বুঝাবার যোগ্যতা তার আছে। তিনি আমাকে বুঝাতে পারলেন। আমি রাজি হয়ে গেলাম। পরে দেশে এসে তাকে এই অর্থ পাঠালাম।

একটি বছর কেটে গেলো। উমরায় যাওয়ার সময় হলো। তার কোন খোঁজ পেলাম না। নিজেই গেলাম। ভাবলাম সেখানে গিয়ে দেখা হবে। হয়তো অন্তত সেখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। গেলাম, দেখাও হলো। তিনি বললেন, সব সময় ব্যবসা এক রকম যায় না। এবার একটু খারাপ গেছে। তবে ভবিষ্যতে অনেক ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি আরো বললেন, তারা কয়েকজনে এক সাথ হয়ে আরো বড় ধরনের কিছু করছেন। সেই জন্য আরো পাঁচ হাজার রিয়াল লাগবে। খুব উৎসাহিত বোধ করলাম না। কিন্তু দেশে আসার পরও তিনি যোগাযোগ রাখলেন এবং আরো বুঝালেন, এই অর্থটুকু না দিলে বিনিয়োগে সবার সাথে শরিক থাকা কঠিন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তাও দিলাম।

এরপর আরো একটি বছর কেটে গেলো। কিন্তু তার পাত্তা নেই। ওখানে গিয়ে খবর নিলাম। বললেন, ব্যবসায় অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এরপর তার সাথে আমি নিজ থেকে আর যোগাযোগ করি না।

সাত আট বছর পর তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে আমার দেখা। তিনি বললেন, সেই ভদ্র লোক এখন পথে পথে ঘুরছে। সব শেষ হয়ে গেছে।

লেখালেখি

রাত প্রায় একটা। বিমানে বসে কিছু লিখছি। চারপাশে অন্যান্য যাত্রীরা বাতি নিভিয়ে ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ কে যেনো পিছন দিক দিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে স্পর্শ করলো। মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখি এক বিমান বালা।

সে বললো,এই মাঝ রাতে তুমি কি করছো? সবাই তো ঘুমাচ্ছে!

বললাম, আমি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য যাচ্ছি। কিছু দিন পর আরেকটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হবে। কাজেই বুঝতেই পারছো অনেক কাজ।

লেখালেখির কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। লিখে যে মজা, তা কি ঘুমিয়ে পাওয়া যায়।

রাতের আমন্ত্রণ

উইনিপেগ শহর। একদিন আমার এক বিদেশী বন্ধুর সাথে শপিং-এ গেছি। পশ্চিমা দেশগুলোতে অধিকাংশ দোকানেই মেয়েরা বেচা কেনা করে। তাদের সেলস্ গার্লস বলা হয়। দোকানে একটি সেলস্ গার্লের সাথে আলাপ হচ্ছে একটি পণ্য কেনার ব্যাপারে । এক সময় সে আমার কাছে এসে বললো, তোমার সাথে একটা কথা বলতে চাই।

বললাম, বলো। সে বললো, বলবো তবে তোমার সাথে একটু একাকী কথা বলতে চাই।

সে বললো, আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কয়েকদিন হলো। আমি খুব একাকী বোধ করছি। তোমার কি আজ রাতে সময় আছে?

এটাই পশ্চিমাদের নিয়ম। গার্লফ্রেন্ড হয়, বয়ফ্রেন্ড হয়। যতদিন ভালো লাগে থাকে একসাথে। কিন্তু একবার যদি বিশেষ সম্পর্কটি হয়ে যায় তা হলে তা ছাড়া কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই একজনের পর অন্যজনকে খুঁজতে থাকে।

ভাবলাম, আমাদের দেশে এ সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিয়ের মাধ্যমে। স্বামী স্ত্রী একজন আরেক জনকে আপন করে নেয় সারা জীবনের জন্য।

তাদের একজনকে ছেড়ে আরেকজন খুঁজতে হয় না।

হিরোশিমা

টোকিও থেকে বুলেট ট্রেনে হিরোশিমায় গেলাম। বড় ইচ্ছা হলো, যে স্থানে এটম বোমা ফেলে আমেরিকা অগণিত মানুষকে হত্যা করেছিল, সেই শহরটি দেখার। গিয়ে দেখলাম, সেখানে এখনও একটা অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। এটম বোমার সাক্ষ্য হিসাবে সেখানে ছোট ছোট নোটিশ বোর্ড লাগানো আছে, সেই হত্যা যজ্ঞের ইতিহাস বর্ণনা করে। ছোট ছোট স্মৃতিসৌধ আছে। দেখলাম, এক মহিলা একটি স্মৃতি সৌধে ফুল দিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, হয়তো তার কোন প্রিয়জন এখানে মারা গেছে। একটি ফুলের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আবেগ প্রকাশ করছে। কিন্তু যার প্রাণ গেছে সে আর নেই। জানি না তার আত্মা এই ভদ্র মহিলার ভালোবাসা ও আবেগের কথা জানতে পারবে কিনা। কিন্তু সে তো একটু প্রেম জানিয়ে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে। মনে একটু শান্তি পাচ্ছে। যেনো জীবিত কাউকে ভালোবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরছে। এই যে আবেগ ও ভালোবাসা, এটাই তো মানুষকে মানুষ বানায়।

ভাবলাম, যে এটমিক প্রযুক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ বানানো যায়, বিশ্বকে আলোকিত করা যায়, সেই প্রযুক্তি দিয়েই মানুষ মারা যায়, হত্যাযজ্ঞ চালানো যায়। আলোকিত বিশ্বকে অন্ধকার করে দেয়া যায়। দোষ প্রযুক্তির নয়, দোষ মানুষের। বিবেকের। বিবেচনার।

নৈতিকতা না থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।

প্রকৃতির পরিবর্তন

ইউরোপের এক উন্নত দেশের হোটেলে আছি। আজ সকালে পত্রিকায় দেখলাম, সমকামী বিয়ের অধিকার ও আইনগত অনুমতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একজন পুরুষ অন্য আরেকজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। একজন নারী আরেকজন নারীকে বিয়ে করতে পারবে। জীবন সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতার এ খবরটি বেশ মজারই বটে।

ভাবলাম, নির্বিচারে শিল্পায়নের ফলে এবং নির্বিচারে কেমিক্যাল বর্জ্য যত্রতত্র নিক্ষেপের কারণে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, জল্লোচ্ছ্বাস আসছে, টর্নেডো হচ্ছে। দুনিয়ার সব প্রাকৃতিক রীতি-নীতিতে পরিবর্তন আসছে। মানুষের রুচিতে পরিবর্তন আসা তো স্বাভাবিক।

একটা নর কুকুর নারী কুকুরের সঙ্গ চায়। একটা ষাঁড় একটা গাভীর দিকে আকৃষ্ট হয়। যে কোন প্রাণী বা জানোয়ার হোক সবাই বিপরীত লিঙ্গের দিকে যায়। এটা তো প্রকৃতির রীতি।

প্রকৃতির পরিবেশের সাথে মনো-পরিবেশের পরিবর্তন তো হবেই।

স্মরণীয় ক্লাশ

আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট।

ছাত্ররা যদি ধর্মঘট ডাকে তা হলে গেইটগুলোতে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়। ক্লাস হয় না। ছাত্ররাও যায় না। শিক্ষকরাও যান না। প্রশাসনের লোকজনও যেতে পারেন না। কিন্তু আমি গেলাম। গিয়ে দেখি তালা লাগানো গেইটের বাইরে আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, হরতাল সত্ত্বেও তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো?

বললো, স্যার, আমরা তো জানি হরতাল হলেও আপনি আসবেন। সেই জন্য আমরাও এসেছি।

তাদের মধ্যে একজন বললো, আমি পেছন দিয়ে গিয়ে দেখি পেছনের দরজা খোলা আছে কিনা। ছাদের উপরে গিয়ে ক্লাস নেয়া যায় কিনা।

সে গেলো। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু সে ফিরে এসে বললো, সব দরজা বন্ধ।

আমি বললাম, চলো আমরা টিএসসি'র দিকে যাই। হয়তো কোন রুম খোলা পাওয়া যাবে। আমি আগে হাঁটছি। পিছনে পিছনে আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা আসছে। টিএসসির দোতলায় গিয়ে একটি রুম পেলাম। যেখানে গান বাজনা হয়। আসলে গান বাজনার রিহার্সাল হয়। সেখানে বসার কোন চেয়ার বা টেবিল ছিলনা। ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে বসে পড়লো। আমি দাঁড়িয়ে ক্লাস নিলাম।

এটি ছিল জীবনের এক স্মরণীয় ক্লাশ।

নেশা

ওর নাম না হয় না-ই বললাম। অতি পরিচিতজনেরই একজন। হঠাৎ করে তার গতিবিধিতে দেখা গেলো আমূল পরিবর্তন। রাত-বিরাতে হাতে সাদা পাউডারের মতো কিছু নিয়ে ছাদে যায়। একাকী কি করে জানে না কেউ। থাকে সবার সাথে নির্লিপ্ত। অনেক পিড়াপিড়ির পর সে মুখ খুললো একদিন। বললো, একবার তার কয়েকজন কলেজ বন্ধু তাকে নির্জনে নিয়ে কিছু একটা দেয়। তা সেবন করে সে অনেকটা অচেতন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে এটি তার ভালো লাগে। পরে সে নিজ বাসার ছাদের উপর গিয়ে একাই তা সেবন করে।

তাকে বুঝানো হলো নেশা ধ্বংস নিয়ে আসে। কিন্তু সে বুঝেও বুঝে না। সে তা ছাড়তেও পারে না। সে বলে, আমি দল ছাড়লে বন্ধুরা আমাকে মেরে ফেলবে। বলা হলো, তোমাকে বিদেশ পাঠিয়ে দেয়া হবে।

সে বললো, তাদের হাত অনেক লম্বা। দল ছেড়ে রক্ষা নেই।

একদিন সকাল এগারটা বাজে। সে ঘুম থেকে উঠছে না। দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করলেও সে দরজা খুললো না। অতঃপর দরজা ভেঙ্গে কক্ষে ঢুকে দেখা গেলো, সিলিং ফ্যানে ঝুলছে একটি মৃত দেহ।

নেশার প্রেম কঠিন। মরা যায়, কিন্তু নেশাকে ভুলা যায় না।

যমযম

উমরাহ পালনের অংশ হিসেবে সাফা ও মারওয়া সা'য়ী চলছে। সা'য়ী হলো সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত সাত বার দ্রুতগতিতে চলা। মাঝে একটা জায়গাতে দৌড়াতে হয়। হঠাৎ করে দেখলাম, দৌড়াতে গিয়ে এক ব্যক্তি পড়ে গেলো। মনে হলো, সে ক্লান্ত অথবা হয়তো তার হার্টের কোন সমস্যা হয়েছে। অথবা স্টোক করেছে। পাশের লোকজন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা কোন ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছে। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইয়াকফিহি যমযম, 'তার জন্য যমযমের পানিই যথেষ্ট', ডাক্তার দরকার নেই। তার গায়ে এবং বুকে যমযমের পানি দিয়ে দাও। তাতেই সেরে উঠবে।

যমযমের পানি হলো আল্লাহর কুদরতের পানি। যখন মা হাজেরা শিশু সন্তান ইসমাঈলের জন্য পানির খোঁজে দৌড়াচ্ছিলেন এবং সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত সাত বার ঘুরছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন, সন্তানের পাশেই পানি বয়ে যাচ্ছে। সেই কূপকেই বলা হয় যমযমের কূপ। সেই পানিই যমযম। আরবের সেই মরুময় স্থানে তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাতে পানি আছে। প্রতিদিন উমরাহ ও হজ্জ পালনকারীরা সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ গ্যালন পানি নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পানির শেষ নেই।

এখান থেকেই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই লোকটি বলেছিল, আল্লাহর কুদরতের পানিই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ সব রোগেরই ঔষধ দিয়েছেন। সবকিছুর উপকরণ দিয়েছেন।

বিশ্বাস ও উপকরণ প্রয়োগ তো সাংঘর্ষিক নয়।

বন্দাই বীচ

অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের কাছে বন্দাই সী বীচ। আমার বিয়াই ড. মির্জার সাথে সেখানে গেলাম। ড. মির্জা হাত জোড় করে বললেন, পানির কাছে যাবেন না। কারণ, সেখানকার ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভাবলাম, ভয়ঙ্কর বা অসাধারন না হলে তা দেখার কি আছে? ভয়ঙ্কর বলেই তো সেখানে যাওয়া। সুতরাং আমি সাহস করে পানির কাছে গেলাম। এক একটা ঢেউয়ের ঝাপটা আসছে যেনো ছোট ছোট পাহাড়। হঠাৎ এক ঢেউয়ের ঝাপটা এতো জোরে এলো যে, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে অনেক দূরে ফেলে দিল। ভাগ্যিস,হাড় ভাঙ্গলো না। কিন্তু পাশেই এক যুবতি মেয়ে। তাকে উঠাবার জন্য স্ট্রেচার আনা হচ্ছে। তার পা ভেঙ্গেছে।

ভাবলাম, এই সীমাহীন সমুদ্র পারে কতো কোটি কোটি ঢেউ এমনভাবে আছড়ে পড়ছে। কে তার খবর রাখে। এই সমুদ্র, পৃথিবী, মহাকাশ, কতো বিচিত্র!

চোখ খুললেই তো উপলব্ধি হয়!

আপনাকে দেখতে এসেছি

একদিন অফিসে বসে আছি। দরজায় ঘণ্টা বাজলে দরজা খুলে দেখলাম, এক বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতরে স্বাগত জানালাম।

জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর?

বললাম, জি হ্যাঁ। উত্তর শুনে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললেন, আপনাকে দেখতে এসেছি।

কথা শুনে আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, বিয়ের জন্য বর বা কনে দেখতে এসে এভাবে তাকায়। আমার বয়সেও হয়তো বিয়ে করা যায়, কিন্তু কাউকে তো বিয়ের কথা বলিনি। তিনি কেনো দেখতে এলেন!

তিনি মুখ খুললেন। বললেন, আমি সেদিন বাসে উঠলাম। প্রচণ্ড ভিড়। তখন এক যুবক ছেলে উঠে আমাকে বসতে দিলো। বললাম, বাবা তুমি কি করো? বললো, আমি ছাত্র। এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কারো নিকট থেকে আজকাল তো এমন আচরণ আশা করা যায় না। ভাবলাম, কে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি চালায় দেখতে যাবো। তাই আপনাকে দেখতে এলাম।

ভালো লাগলো। বললাম, যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ বানায় না, তাকে কি শিক্ষা বলা সাজে?

কাশগড়ি

তাঁর নাম আব্দুর রহমান কাশগড়ি। রাশিয়ার কাশগড় স্থানে তাঁর জন্ম। কিন্তু কোন কারণে তিনি ঢাকা শহরকে তাঁর বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি এখানে শিক্ষকতা করেন। একজন পণ্ডিত মানুষ। তিনি বিয়ে করেননি। কি কারণে করেননি তা জানা নেই। কেউ কেউ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সারা জীবন বিয়ে করেন না। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেন। তাঁর জীবনে এমন কিছু হয়েছে কি না তা কখনো জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু মানুষের মনে একটা পরিবার বা সংসারের কামনা তো থাকেই। সুতরাং তিনি কারো এক শিশুপুত্রকে পালক হিসেবে গ্রহণ করেন। বাসায় কাজের মহিলা থাকলেও তিনি নিজেই তার সেবা যত্ন করেন। এমনকি মলমূত্র পরিষ্কার করেন। ছেলেটি বড় হলো। তিনি অনেক আদর করে বিয়ে করালেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই ছেলেটি তার বউ নিয়ে আলাদা হয়ে অন্যত্র চলে গেলো।

একদিন তাঁর সাথে কথা হলো। অনেক দুঃখ করে বললেন, তাকে সুন্দরী এক মেয়ে বিয়ে করিয়েছিলাম। বউটি ভালো, কিন্তু আমার ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

তাঁর চোখে লক্ষ্য করলাম অশ্রু।

নাজিব

ঢাকার হোটেল লা মেরেডিয়ান-এ সে দিন একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয়ে গেলো। কী-নোট স্পিকার হিসেবে এসেছিলেন মালয়েশিয়ার এক প্রফেসর।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, টুনরাজাকের মতো এমন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ছেলে নাজিব কি সত্যি দুর্নীতিবাজ? মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরা তো এ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বলেই জানি।

তিনি বললেন, নাজিব তেমন দুর্নীতিবাজ নয়। দুর্নীতির গোড়া হলো তার ঘরে। তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর চাহিদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা মেটাতে গিয়ে তাকে পুকুর চুরি করতে হলো। আর সেই কারণেই এখন তাদের নাজেহাল হতে হচ্ছে।

ভাবলাম, স্ত্রীই তো ঘরের আনন্দ। তা হলে কি তার কারণে অন্য কিছুও হতে পারে!

শৈল্পিক ভূষণ

তাপমাত্রা যদি শূন্য হয় তা হলে পানি জমে বরফ হয়ে যায়। তাপমাত্রা যদি আরো কমে তা হলে পানি আরো দ্রুতগতিতে বরফ হয়। তাপমাত্রা যদি আরো কমে যায় এবং মাইনাস ফোরটি হয় তা হলে কি হবে বুঝাই যায়।

কানাডার উইনিপেগের কথা। শীতে কখনো কখনো সেখানে তাপমাত্রা মাইনাস ফোরটি হয়। তুলোর মতো বরফ পড়তে থাকে। সকালে বাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তা ঘাটে উঁচু হয়ে পড়ে থাকে বরফ। গাড়ি চালাতে হলে সেই বরফ সরাতে হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বরফ সরাবার পার্টি থাকে। গাড়িগুলোকে পার্ক করার সময় ইলেক্ট্রিক তার লাগিয়ে হিটিং বা উষ্ণায়নের ব্যবস্থা রাখতে হয়। তা না হলে গাড়ি এবং এর ইঞ্জিন জমে যায়। ঘরের বাইরে যেতে হলে এক গাদা গরম কাপড়ের ভিতরে নিজ দেহকে ঢুকিয়ে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়।

কিন্তু কি অবিচার নারীদের উপর। এই শীতেও তাদের গায়ে কাপড় জোটে না। তার পা উরু পর্যন্ত খোলা থাকে। হাত ও বাহু খোলা এবং দেহে সংক্ষিপ্ত পোশাক। এই পোশাকেই চলতে হয় তাদেরকে।

আমি নারীদের এই অবস্থার কথা একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, এটি হলো নারীদের শৈল্পিক ভূষণ।

ভাবলাম, নারীকে ঠকাবার ভলো কৌশল তো!

মুশুরি

ভারতের এই রাজ্যটির নাম উত্তর খন্দ। পূর্বে এটি ছিল উত্তর প্রদেশ বা ইউপি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখন আলাদা করে নাম দেয়া হয়েছে উত্তরখন্দ। শুনলাম, এই রাজ্যে মুশুরি পাহাড়টি অনেক উঁচু। অনেক পর্যটক সেখানে যায়। আমাদেরকেও সেখানে যেতে উৎসাহিত করা হলো। চললাম। সেই পাহাড়ের পৌছার পূর্বেই সন্ধ্যা নেমে এলো। এক হোটেলে রাত কাটালাম। হোটেলটির নাম হলো পার্লগ্রান্ট। এখানে এটিই সবচেয়ে ভালো হোটেল। বিছানায় যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেলো। আবার সকালেই রওয়ানা দেওয়ার কথা। কারণ, পরের দিন এই মুশুরি পাহাড় ছাড়াও আমাদের হাতে অনেক পরিকল্পনা আছে।

কাজেই সাত সকালে রওয়ানা দিলাম। পাহাড় বেয়ে বেয়ে চূড়ায় উঠলাম। কিন্তু উপরে উঠার সময়কার নান্দনিক দৃশ্য ছাড়া উপরে তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। কোথায় যেতে হবে তারও ভালো পথনির্দেশনা ছিল না। প্রায় শেষ দিকে গিয়ে ভাবলাম, হয়তো আরো সামনে আছে। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার পরে কাউকে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম, আমরা আবার অন্য পথে ঘুরে ফেরত যাচ্ছি। কাজেই গাড়ি ফিরিয়ে আবার পিছনে গেলাম। কিছু পাথরের বড় বড় খণ্ড দেখতে পেলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম। কিন্তু সেই স্থানটি দেখতে এতো লম্বা পথ ভ্রমণ কতটুকু যৌক্তিক ছিল তাই ভাবছিলাম।

সাবাস বিজ্ঞাপন প্রণোদনা!

বাস খালি

দিল্লি যাওয়ার জন্য ঢাকা এয়ারপোর্টে বিমানে উঠলাম। বিমানের ভিতর দেখে হাসি পেলো। এতো বড় একটি বিমান মাত্র দশ বার জন যাত্রী। আমি একাই যাচ্ছি। বিমান তখনো ছাড়েনি। আমার স্ত্রীকে ফোন করে বললাম, চলে আসো, বাস খালি। বললাম, এই বড় বিমানে যাত্রী মাত্র কয়েকজন। সবটাই খালি। তুমি বরং চলে আসতে পারো। দুজনেই হাসাহাসি করলাম। কারণ বিমান খালি থাকলেও তো এইভাবে যাওয়া যায় না। টিকেট করা লাগবে। কিন্তু সেটা ছিল কথার কথা।

মনে পড়ে গেলো একবার ওয়াশিংটন থেকে আরেকটি শহরে যাচ্ছিলাম। বসে আছি। এমন সময় এয়ারলাইন্স থেকে ঘোষণা করা হলো, কোন যাত্রী যদি স্বেচ্ছায় এই ফ্লাইটে না গিয়ে অন্য ফ্লাইটে যাওয়ার জন্য রাজি থাকেন তা হলে তাকে একটা টিকেটের পরিবর্তে দুটা টিকেট দেয়া হবে। অর্থাৎ আরেকটা টিকেট ফ্রি দেয়া হবে।

কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি?

বললো, যেহেতু অনেক সময় বিমানযাত্রীর সবাই আসে না, সেহেতু আমাদের ওভার বুকিং থাকে। সাধারণত ওভার বুকিং থাকলেও সমস্যা হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে যাত্রী যদি বেশি চলে আসে তা হলে তাদেরকে ঐচ্ছিকভাবে একটা সুযোগ দেয়া হয়। যারা স্বেচ্ছায় এই ফ্লাইটে না গিয়ে টিকেটটি ফেরত দিতে চায়, তাকে আরেকটা টিকেট ফ্রি দেয়া হয়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এই টিকেটটি ফেরত দিবে?

বললাম, না। আমি দিতে পারবো না। কারণ, আমার কনফারেন্স আছে। সেখানে আমার প্রবন্ধ উপস্থাপন করার কথা।

বিমানের এই দুটি ব্যাপার বিমান ব্যবসার মার্কেটিং সম্পর্কে অনেক কথা বলে দেয়। কখনো খালি, কখনো ভীড়, কখনো উপচে পড়া ভীড়। কখনো এতো যাত্রী যে, সবার সংকুলান হয় না। আর এই অবস্থা বুঝেই ওভার বুকিং করা হয়।

দুনিয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্য কতই না বিচিত্র!

ক্ষমতার মোহে ক্ষমতা শেষ

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। থাকি সূর্যসেন হলে। সে হলে আরেক জন মেধাবী ছাত্র থাকে। দেখতে লম্বা। রং ফর্সা। কথাবার্তায় অমায়িক, ভদ্র, বিনয়ী। আমাকে অত্যন্ত সমীহ করে। একদিন সে আমার কক্ষে এলো। বললো, আমার এক বন্ধু আমাকে এমন কাজে উৎসাহিত করেছে যা আমি ভালো মনে করছিনা। কিন্তু তবু করছি।

বললাম, সে কি কাজ?

সে বললো, আমার দেহটা শুকনো ধরনের। স্বাস্থ্যবান নয়। তেমন শক্তি নেই। আমার বন্ধু পরামর্শ দিলো আমি যদি মদ খাই, তা হলে স্বাস্থ্য ভালো হবে। কাজেই আমি মদ ধরেছি।

আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, ভালো খাওয়া দাওয়া করলে, ব্যায়াম করলে শরীর ভালো থাকবে। মোটা তাজা হওয়াই বড় কথা নয়।

কয়েকদিন পর আবার দেখা হলো তার সাথে। জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম, তার বন্ধুর প্রভাব তার উপর অনেক বেশি। কারণ, তাতে তার শরীর ভালো হবে। দেখতে আরো সুন্দর লাগবে। সুন্দরী মেয়েরা তার দিকে তাকাবে। আমি শুধু মনে মনে দুঃখ করলাম। কিন্তু করার কিছু ছিল না।

আরেকদিন তার সাথে দেখা। সে বললো, আমি এতো নিরীহ ছাত্র যে, কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না। আমি ক্ষমতা চাই। সে জন্য আমি ছাত্ররাজনীতিতে যোগ দিয়েছি।

তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, ছাত্রজীবন হলো পড়ার সময়, রাজনীতির সময় নয়। কিন্তু আমার বুঝানোতে কিছুই হলো না। তার ক্ষমতা দরকার। এরপর থেকে সে আমার সাথে আর কথা বলে না। তার দল আছে। বল আছে। তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। সাধারণ ছেলেরা তাকে ভয় পায়।

আমি থাকি ছয় তলায়। সে থাকে তিন তলা বা চার তলায়। একদিন রাত্রে টের পেলাম সে আমার পাশের এক রুমে ঢুকেছে। তার সাথে আরো কয়েক বন্ধু। রাত একটা কি দুটা হবে। শুনতে পেলাম, বাইরে থেকে কেউ তাকে ডাকছে। সে দরজা খুলছে না। এরপর তার গ্রুপের

এবং তার অত্যন্ত আপন এক ছাত্র তাকে ডাকছে,"তুই দরজা খোল, বেরিয়ে আয়। তোর কোন ভয় নেই।" শুনতে পেলাম, খট্ করে দরজা খুললো। পায়ের শব্দে বুঝতে পারলাম তাকে এবং তার বন্ধুদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বুঝতে পারলাম, ছয় তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ, এতো রাত্রে লিফ্ট বন্ধ। কিছুক্ষণ পরেই তার চিৎকার শুনতে পেলাম। কিন্তু ভয়ে কেউ দরজা খুললো না। মহসীন হল কাছেই। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম সেই হলের নিকট থেকে গুলির আওয়াজ আসছে।

সকালে শুনতে পেলাম সেই ছেলেটি এবং তার সাথে আরো ছয়জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

সে ছিল তার পিতামাতার একমাত্র ছেলে।

বারান্দা ফ্রিজ

আমি মাছ খেতে ভালোবাসি। উইনিপেগ শহরে বড় বড় দোকানে মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু সবই ফ্রোজেন। দামও বেশি। আমার এক বন্ধু বললো, অনেক দূরে জেলেদের এলাকা। তাদেরকে ফোন করলে মাছ পাঠিয়ে দেয়। তবে এক সাথে অনেক মাছের অর্ডার দিতে হয়। সে আরো বললো, অনেক বাঙালি এবং এশিয়ান যারা মাছ পছন্দ করে তারা এইভাবে সরাসরি জেলেদের নিকট থেকে মাছ আনার ব্যবস্থা করে।

আমার সায় পেয়ে বন্ধুটি আমার জন্য ভালো ভালো মাছের একটা বড় অর্ডার দিয়ে দিলো। পরের দিন মাছ এলো। কিন্তু আমি ভাবিনি, আমার ফ্রিজে তো এতো মাছ সংকুলান হবে না। আমার বন্ধুকে ফোন করে পরামর্শ চাইলাম। সে বললো, তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখি। ফ্রিজে মাছ রাখবে কেন। মাছ বারান্দায় রেখে দাও। তবে হ্যাঁ, কিছু মাছ ফ্রিজের ভিতরও রাখো। দেখো কোনটা ভালো ফ্রিজ। সুতরাং তাই করলাম।

ঘণ্টাখানেক পর ফ্রিজ খুলে দেখলাম, ফ্রিজের মাছ তখনও ফ্রোজেন হয়নি, বরং তখনো নরম। এরপর বারান্দায় গেলাম। দেখি মাছগুলো ফ্রোজেন হয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। ফ্রিজে যে ঠাণ্ডা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ঠাণ্ডা হলো বাইরে। সে শীতের দিনটিতে বাইরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ফরটি। সুতরাং বারান্দাই বেশি কার্যকরী ফ্রিজ।

প্রতিপক্ষের হাত ধরে ক্ষমতায়

ড. মাহাথিরের পর নাজিব রাজ্জাক মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হন। এ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অভিযোগ আসে। তিনি অনেকে কৌশলে ও গোপনে দুর্নীতি করেন। রাষ্ট্রীয় ফান্ডের হাজার হাজার কোটি টাকা সরাসরি তার এ্যাকাউন্টে জমা হয়। দেশের অর্থনীতি রসাতলে যেতে থাকে। তিনি দেখলেন, নাজিব থাকলে দেশের বারটা বেজে যাবে। যে করেই হোক, নাজিবকে থামাতে হবে, ঠেকাতে হবে, বিদায় দিতে হবে।

মাহাথির যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর অতি ঘনিষ্ট আনোয়ার ইব্রাহীম ছিলেন তাঁর ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। আনোয়ারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে তাঁকে শুধু অপসারিত হতে হয়নি, তাঁকে জেলেও যেতে হয়। এভাবে পক্ষের ঘনিষ্ঠজন পরিণত হন প্রতিপক্ষে।

আনোয়ার এখনো জেলে। আনোয়ারের জনপ্রিয়তার ভয়ে নাজিবও তাঁকে জেলের চার দেওয়ালের বাইরে যেতে দেননি।

দেশপ্রেমিক মাহাথিরের বয়স এখন তিরানব্বই বছর। আর জনপ্রিয় আনোয়ার জেলে যাকে মাহাথির অপসারন করেছিলেন, যার ফলে তাদের বর্তমান সম্পর্ক হলো প্রতিপক্ষের। কিন্তু কি করা যায়, আনোয়ার তো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর দল 'কে আদিলান রাকয়াত' (People's Justice Party) এর জনসমর্থন অনেক। নজিবকে সরাতে হলে আনোয়ারের প্রয়োজন। সুতরাং মাহাথির জেল হসপিটালে গিয়ে অসুস্থ আনোয়ার ইব্রাহীমের সাথে দেখা করেন। বলেন, অতীতে যা হওয়ার হয়েছে। মালয়েশিয়াকে বাঁচাতে হবে। চলো, দুজন একসাথে কাজ করি।

আলোচনা হলো, সহযোগিতার সিদ্ধান্ত হলো। আনোয়ার ইব্রাহীমের পার্টি নিয়ে 'পাকাতাক হারাপান' ঐক্যজোট হলো। অন্যান্য ছোট দল যোগ দিল। ২০১৭ সালে নির্বাচন হলো। নির্বাচনে ঐক্যজোট জয়ী হলো। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার পর থেকে বরাবরই 'আমনু' ক্ষমতায় ছিল। এই প্রথম এর ভরাডুবি হলো। নাজিব এবং তার দল পরাজিত হলো। মাহাথির আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন।

রং মহল

নয়াদিল্লির রেডফোর্ট দেখতে গেলাম। ভিতরে ছিল মোঘলদের বাসস্থান। আমাদের গাইড ভিতরের একটি প্রাসাদ দেখিয়ে বললো, এটি হলো রং মহল। এখানে গায়িকা, নর্তকী এবং বিনোদন দানকারী মেয়েরা থাকতো। নাচ ও গানের আসর বসতো।

কুরআনে অনেক জাতির উত্থান পতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মানব ইতিহাসেও অনেক জাতির উত্থান ও পতনের বর্ণনা রয়েছে। কোন জাতির যখন মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়, অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং আনন্দ ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেয় তখন সে জাতির পতন আসে। মুঘলরাও তো এ সাধারণ নীতির বাইরে নয়। কখনো হয়েছে তাদের উত্থান, কখনো পতন। কখনো তাদের ভালো সময় গেছে, কখনো খারাপ।

ভালো মন্দের এই উত্থান পতনে হয়তো এই রং মহলেরও ভূমিকা ছিল।

দুই প্রগতিশীল বন্ধু

দুই বন্ধু। তারা একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ছাত্র। দুজনেই প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত। যারা ধর্মকর্ম করে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রবাসের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে। তাদেরকে তারা সেকেলে মনে করে। প্রতিক্রিয়াশীল বলে।

তারা দুজনেই লেখাপড়ায় অনেক ভালো। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়। পরে তারা দুজনেই উত্তর আমেরিকায় পিএইচ.ডি করতে যায়। এক বছর পর তারা দুজনেই ঢাকায় বেড়াতে আসে। একদিন তারা ঢাকা শহরে এক সাথে রিক্সায় করে কোথায় যাচ্ছিল। এমন সময় আসরের নামাযের আযান হলো।

তাদের মধ্যে একজন বললো, তার এখানে একটু কাজ আছে। একটু যেতে হবে। এই বলে সে নেমে গেলো।

আরেকজনও বললো, তুমি যখন যাচ্ছ তা হলে আমি আর রিক্সা নিচ্ছি কেন। আমারও একটু কাজ আছে। আমি কাজ সেরে যাই।

একথা বলে তারা দুজন দুদিকে চলে গেলো। কিন্তু একি আশ্চর্য, পাশের যে মসজিদে আযান হয়েছিল তারা দুজনেই দুদিক দিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তখন তারা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলো। তারা একজন আরেকজনকে বললো কিভাবে বিদেশে তারা এই পথে ফিরে আসে। বললো, তারা তাদের এই পরিবর্তনকে একে অপর থেকে গোপন রেখেছে, যেনো সেকেলে বলে গালি না খায়।

কুকুর জীবন

অস্ট্রেলিয়ার লিভারপুলে গাড়ি থেকে নামলাম। এক নারী অতি আদরে এক মূল্যবান স্ট্রলারে তার বাচ্চাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ভাবলাম, আমাদের দেশে জন্ম না নিয়ে এখানে জন্ম নেয়া এই শিশুর কতই না বড় কপাল। হঠাৎ সামনে দেখি এক ব্যক্তি এমনি এক স্ট্রলারে আদরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার গৃহপালিত কুকুরকে। দাঁড়ালাম এবং একটা ছবি নিলাম। লোকটি বললো, আই লাভ মাই ডগ।

মনে হয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশের মানব জীবনের চেয়ে এই কুকুর জীবনই যেনো ভালো!

কিন্তু তা কি সত্যি ভালো? তা-ই ভালো, যদি সুখে জীবনটা কাটিয়ে দেয়াই জীবনের লক্ষ্য হয়। কিন্তু তখন সে কুকুর জীবন আর মানবজীবনে পার্থক্য থাকে না।

কষ্টের মানব জীবন এমন সুখের জীবন চেয়েও ভালো, যদি জীবনের কোন মানবীয় লক্ষ্য থাকে।

বিদেশী বউ

মনে পড়ে গেলো উইনিপেগের কথা। আমি সেখানকার ছাত্র। সেখানে আরো কয়েকজন বাঙালি ছাত্র আছে। বাঙালি সমাজে একজন বিখ্যাত ডাক্তার আছেন। তিনি সেখানে বিয়ে করেছেন। প্রচুর অর্থের মালিক তিনি। হসপিটালের মালিক। গগণচুম্বী দালান কোঠার মালিক। তিনি এক সী-বীচে বহু মূল্যবান পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি তার সাথে পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য আমাদের বাঙালি ছাত্রদেরকে আমন্ত্রণ জানান। কারণ, তার বিদেশী বউ এবং সন্তানরা তাকে সঙ্গ দেয় না।

এক সময় তিনি হয়তো মহা আনন্দে এক লাল টুক টুকে বিদেশীনীকে বিয়ে করেছেন। আনন্দেই গেছে যৌবন। কিন্তু এখন তার বার্ধক্য। সব আছে, কিন্তু পরিবার নেই। স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। তারা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে নেই।

সম্মতি থাকলে অসুবিধা কি

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের টিম লিডার ছিলেন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালযের অর্থনীতির এক প্রফেসর। তার সাথে ছিলেন আরো দুজন বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশ থেকে সদস্য তিন জন। তার মধ্যে আমি একজন। তাদের একজনের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি বাংলাদেশে একা আছেন। তার স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়ে আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। সে তার মেয়েকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

বললাম, তোমার স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি, আর তুমি আছ এখানে। মেয়েকে একা সেখানে রেখে অসুবিধা নেই তো?

তিনি বললেন, সে তো প্রাপ্ত বয়স্কা। তার সম্মতিতে সে যা কিছু করে তাতে কি অসুবিধা?

বললাম, তা তো বটেই। এরপর বললাম, তোমাদের উদার জীবন তো অনেক মজার। তবে আমার মনে একটা কৌতূহল আছে। আগেও কি আমেরিকার মানুষের চিন্তা চেতনা একই রকম ছিল?

তিনি বললেন, তারা ছিল অনেক গোঁড়া এবং সেকেলে প্রকৃতির। তাদের চেয়ে আমরা এখন ভালো আছি।

ভাবলাম, স্থান, কাল, পাত্রভেদে মানুষের চিন্তা চেতনা এবং সুখ শান্তির ধারণা কতই না বদলায়!

ভাসমান বাজার

থাইল্যান্ডের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ আসে পর্যটন শিল্প থেকে। তারা অনেক কিছু করেছে পর্যটনকে আকর্ষণীয় করার জন্য। তার মধ্যে একটি হলো ভাসমান বাজার। ভাবলাম, সেই বাজারটি গিয়ে দেখি। তা দেখার জন্য আমাদের প্রায় শত কিলোমিটার ভ্রমণ করতে হলো। নামলাম একটি স্থানে। সেখান থেকে উঠতে হলো ভাড়া করা নৌকায়। নৌকায় যেতে হলো বেশ দূরে। সেখানে দেখা গেলো কতগুলো নৌকায় নানা ধরনের ফল, সবজি। বিভিন্ন ধরনের পণ্য নিয়ে কতগুলো নৌকা ভাসছে। এমনকি অনেকগুলো নৌকা পাড়ের নিকট বাধা আছে। সেই ডাঙ্গায়ও দোকানপাট আছে। কিন্তু সেখানকার আকর্ষণ হলো পাশের ভাসমান নৌকাগুলো। সেখানে গিয়ে উঠানো হয় ছবি। সে ছবি একটা স্মরণীয় জিনিস, যা দেখার মতো।

কতো সুন্দর কায়দা! ডাঙ্গায় জিনিসগুলো পাওয়া যায়, কিন্তু সেখান থেকে নৌকায় নিয়ে ডাঙ্গার কাছেই অথবা একটু দূরে তারা পসরা সাজিয়ে বসে আছে। ক্রেতারা অন্য নৌকা ভাড়া করে সেখানে গিয়ে সেগুলো ক্রয় করছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য কতো ধরনের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে!

ভাবলাম, বাংলাদেশে এ ধরনের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা কি সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি?

হারানো ফোন

কোরিয়া থেকে একটা ফোন কিনলাম। বড়ই সখের ফোন। ফেরার পথে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে নামলাম। লাউঞ্জে বসতে হলো বেশ কতক্ষণ। সেখানে আনাস সে ফোনটি নিয়ে গেম খেলছিল। পরে যাত্রার সময় ঘোষণা করলে আমরা লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বিমানে চড়লাম। পৌছলাম ঢাকাতে।

সেই শখের ফোনটি তখনও ব্যবহার শুরু করিনি। আগের পুরোনোটিই ব্যবহার করছিলাম। হঠাৎ করে একদিন একটা ই-মেইল পেলাম কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর থেকে। তাতে বলা হয়েছে, তোমার একটি ফোন বিমান বন্দরের লাউঞ্জে পাওয়া গেছে। ভাবলাম, তা কি করে হয়? আমি আমার ব্যাগ খুঁজলাম। দেখলাম, কোথাও নতুন ফোনটি নেই। এরপর আমি ই-মেইলের জবাব দিলাম। তারা বললো, তারা এই ফোনের কোড নাম্বারের তথ্য ধরে কোরিয়া থেকে ক্রেতা হিসাবে আমার নামটি পেয়েছে, ই-মেইল ঠিকানা পেয়েছে। সেই ঠিকানা দিয়ে আমাকে জানানো হলো যে, তাদের কাছে ফোনটি রয়েছে।

ফোনটি ছিল বেশ দামী। হিসাব করে দেখলাম, আমি যদি বিমানের টিকিট কিনে কুয়ালালামপুর গিয়ে ফোনটি নিয়ে আসি, তা হলেও সে খরচ ফোনের দামের চেয়ে কম হবে। ভাবলাম, তা যদি করতে হয় করবো।

আমি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে একটি ই-মেইল পাঠালাম। বললাম, পরের কোন ফ্লাইটে ফোনটি ঢাকায় পাঠানো যায় কিনা। তারা বললো, হ্যাঁ পাঠানো যায়। এরপর একটি ফ্লাইটে সে ফোন পাঠানো হলো। আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফোনটি সংগ্রহ করলাম।

ভাবলাম, এটাকেই তো সততা বলে। এই ফোনটি কুয়ালালামপুরের বিমানবন্দরের যাত্রী লাউঞ্জে পাওয়া গেছে। যে বিমানবন্দর কর্মী তা পেয়েছে সে অনায়াসে তা নিয়ে নিতে পারতো। কিন্তু নেয়নি। সে তা অফিসে জমা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ সেটাকে তার মালিকের নিকট পৌছে দিতে এতো কষ্ট স্বীকার করলো! ভালো লাগলো। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে গেলো।

ভাবলাম, আমরা যদি সবাই এমন হতে পারতাম!

নুরান সিস্টার্স

সংগীত শিল্পীর দলটির নাম নুরান সিস্টার্স। ভারতের শিল্পী। দলের সদস্য তিনজন। পিতা, যিনি সংগীত শিল্পী, এবং তারই শিষ্য দুই মেয়ে, যাদেরকে তিনি আদর করে সংগীত শিখিয়েছেন। তারা ভারতসহ গোটা বিশ্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যায় । তাদেরকে সুফি সংগীত শিল্পী বলা হয়। তারা আধ্যাত্মিক গান গায়, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতে। তাদের মধ্যে ছোট মেয়ে য্যোতি নুরানের কণ্ঠ অত্যন্ত মধুর। তার সংগীতের সুরে মানুষকে নাচতে দেখেছি।

সেদিন হঠাৎ করে ফেসবুকে দেখলাম, য্যোতি নুরানের মা এবং বাবা কেঁদে কেঁদে বলছেন, একটি ছেলে প্রেমের নামে য্যোতি নুরানকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। সে প্রাপ্ত-বয়স্কা নয়। সে নিজেই বিয়ে করতে পারে না এবং প্রেম করে চলে যেতে পারে না। তাকে ভাগিয়ে নেওয়ায় এই সংগীত দলটি ভেঙ্গে গেছে।

তার মা চোখের জলে বলছে, এই মেয়ে ভুলানো প্রেমে আমাদের শিল্পী সংসার শেষ হয়ে গেলো।

বিশ থেকে দুই

হজ্জের সময় গোটা বিশ্ব থেকে মানুষ মক্কা নগরীতে হাজির হয়। মানুষে ভর্তি থাকে গোটা শহর। রমযান মাসেও তেমনি হয়। বিশেষ করে রমযানের শেষ দশ দিন। তখন কা'বা ঘরে হজ্জের সময়ের চেয়েও বেশি ভীড় হয়। কারণ তখন শবে কদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাতে সবাই কাবা ঘরে অবস্থান নেয়, অথচ হজ্জের সময় মানুষ গোটা মক্কা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এর প্রভাব পড়ে কা'বা ঘরের আশেপাশের হোটেলগুলোতে। তখন হোটেলের ভাড়া বেড়ে যায় অনেক বেশি।

একটা উদাহরণ দেই। আমি এই তো গত রমযানের শেষ কয়েকদিন কাবা ঘরের পাশের এক মাঝারি মানের হোটেলে ছিলাম। প্রতি দিন হোটেল ভাড়া ছিল প্রায় বিশ হাজার টাকা। রোযার শেষ তারিখ পর্যন্ত এ হারে ভাড়া দিলাম। ঈদ হলো। রোযা শেষ। শবে কদর শেষ। হোটেলের বিশেষ চাহিদাও শেষ। ঈদের পরের দিন আমাকে হোটেল থেকে বলা হলো, এখন থেকে প্রতিদিন ভাড়া হবে দু'হাজার টাকা।

আমি অর্থনীতির ছাত্র। চাহিদা ও যোগানের উপর যে দাম নির্ভর করে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো। ভাবলাম, যাদের এ সহজ তত্ত্বটি বুঝতে কষ্ট হয়, তারা রমযানের শেষ দিকে সেখানে গেলে এ তত্ত্বের বাস্তব শিক্ষা পাবে।

মাথায় বিদেশের কিড়া

বাংলাদেশে বিদেশে যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। বিদেশে দক্ষ শ্রমিকের ভালো বেতন। কিন্তু অদক্ষ শ্রমিকের দুঃখের সীমা নেই। তবু অশিক্ষিত অদক্ষ লোকেরা সে কথা বুঝতে চায় না। দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চায় না। বিদেশে গেলেই প্রচুর অর্থ পাওয়ার যাবে, এটাই চিন্তা।

আমাদের গ্রামের এক লোকের কথা বলছি। তার কিছু জমি আছে। চাষ করে। কিছু জমি বর্গা করে। সুন্দরভাবে সংসার চলে। হঠাৎ তার মাথায় বিদেশ যাওয়ার কিড়া বাসা বাঁধলো। আমার কাছে এসে বললো, বিদেশে যেতে চাই। ক্ষেতের কাজ করে আর কষ্ট করতে চাই না। বিদেশে গেলে প্রচুর পয়সা পাওয়া যায়। অবশ্য যেতে কিছু পয়সা লাগবে। আমাকে সে পয়সা দিয়ে সাহায্য করুন। আমি তাকে বুঝালাম। অনেক বুঝালাম। বললাম, অনেকেই বিদেশে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। সব হারিয়ে খালি হাতে ফিরে এসেছে। কিন্তু কাজ হলো না। নাছোড় বান্দা। সে যাবেই।

সে আমার আম্মার কাছে গেলো। তিনি আমাদের গ্রামে গরীবের মা বলে পরিচিত। কারো দুঃখ দেখলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি আমার নিকট থেকে এবং অন্যভাবে অর্থ জোগাড় করে দিলেন। সে বিদেশে গেলো। কিন্তু বিদেশের কষ্ট সহ্য হয় না। ফিরে এলো। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার মাথায় কিড়া উঠলো। একবার সফল হতে পারেনি। আরেক বার চেষ্টা করবে। আবার সেই একই দশা। এখান সেখান থেকে টাকা জোগাড় করে গেলো বিদেশ। গিয়ে ফান্দে পড়লো। যে চাকুরির আশায় গেছে তা পেলো না। বেতন তার নিজেরই হয় না! দেশের ঋণ কিভাবে শোধ করবে, পরিবার কিভাবে চলবে। কান্নাকাটি করলো। পরে অন্যান্য বাঙালির সাহায্যে সে দেশে ফিরে এলো।

বাড়ি এসে তার করুণ অবস্থা। সবার ঋণ দিতে হবে। বাকি জমি বিক্রি করে তার ঋণ শোধ করতে হলো। কঠিন অবস্থা তার পরিবারের। খাবার নেই, কাপড় নেই। চিকিৎসার পয়সা নেই। ছেলে কাঁদে, মেয়ে কাঁদে, বউ ঝগড়া করে। আর সহ্য হয় না। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। হাঁটতে পারে না। কিন্তু এক বিকেলে ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারে না। যা হোক, হারিয়ে যায়নি। ফিরে এসেছে সন্ধ্যায়। রাতে বিছানায় গেছে। সকালে উঠে দেখা গেলো, লোকটির মুখ থেকে ফেনা ঝরছে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। ডাকাডাকি করা হলো। কোন সাড়া নেই। চেতন নেই।

আব্বু তুমি আর মদ খেয়ো না

আমেরিকার একটি শহর। অনেক বাঙালি পরিবার আছে সেখানে। কেউ কেউ পশ্চিমা সংস্কৃতি ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। সেখানকার চাকচিক্যের সংস্কৃতিতে তারা ভালোভাবেই মিশে গেছে। তাদের অনেকে নিজ সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য তেমন উৎসাহ অনুভব করে না।

অপরদিকে যারা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে তেমনভাবে মিশে যেতে পারেনি, তারা নিজ সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই জন্য তারা একটা সানডে স্কুল করেছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সেখানে বাঙালি প্রবাসীরা আসে। সেখানে ছোটদের জন্য খেলা ধুলার ব্যবস্থা আছে।

একটি পরিবারের কথা। আধুনিক পরিবার। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই পানীয় গ্রহণ করেন। নাইট ক্লাবে যান। তাঁদের ছেলে স্কুলে যায়। তার সাথে স্কুলে অন্য একটি বাঙালি ছেলের পরিচয় হয়, যে সানডে স্কুলে যায়। তার উৎসাহে এই আধুনিক পরিবারের ছেলেটিও সানডে স্কুলে যেতে চায়। বাপ মা তাকে সেখানে দিয়ে আসেন। কিন্তু খেলা ধুলার পাশাপাশি ছেলেটি সেখানে কি শিখছে সে দিকে খেয়াল রাখেন না তাঁরা।

এক সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাসায় মদ খাওয়ার জন্য বোতল নিয়ে বসেছেন। এ সময় তাদের ছেলেটি সেই মদের বোতল ধরে বলে, আব্বু তুমি আর মদ খাবে না।

সানডে স্কুল তাকে বদলে দিয়েছে।

কান্নাপার্টি

আমি সপরিবারে একবার রাজস্থানসহ ভারতের আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখতে গেলাম। কয়েক দিনের জন্য ড্রাইভারসহ একটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। কোন্ শহরে গিয়ে কোথায় থাকবো, তাও চুক্তিতে ছিল। আমরা রাতে হাভিলিতে থাকতাম। এগুলো হলো পুরনো ঐতিহাসিক স্থাপত্যের স্থাপনা যাকে হোটেল রূপে রূপান্তরিত করা হয়েছিলো। তাতে ঐতিহাসিক স্মৃতি ও আমেজ জড়িত। কাজেই সেইগুলোকেই বেছে নিয়েছিলাম।

একদিন সন্ধ্যার পর এক হাভিলিতে আছি। পাশের কোথাও থেকে অতি উচ্চ স্বরে করুণ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হাভিলের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে?

বললো, পাশের বাসার এক ভদ্রলোক মারা গেছেন। সেই জন্যই কান্না।

জিজ্ঞেস করলাম, এতো লোক একই সঙ্গে কান্নাকাটি করছে তা কেমন করে হয়?

তারা বললো, ওরা বেশ পয়সা খরচ করে ভালো কান্নার দল এনেছে।

কথাটি বুঝতে পারলাম না। এর অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। কথাবার্তা বলে যা বুঝা গেলো তা হলো এই, কোন ব্যাক্তি মারা গেলে কান্নাকাটি করার জন্য পেশাদার কান্না পার্টি আছে। তাদেরকে ভাড়া দিয়ে আনতে হয়। তারা আত্মীয় স্বজনের পক্ষে কান্নাকাটি করে। যারা যতো বেশি পয়সা দিতে পারে তারা ততো ভালো কান্না পার্টি আনতে পারে এবং কান্না ততই ভলো হয়।

ভাবলাম, পৃথিবীতে পেশার কত বৈচিত্র!

ড্রাইভারের বাসায়

দিল্লিতে নেমে প্রায় সপ্তাহ খানেকের জন্য একটা গাড়ি ভাড়ায় নিলাম ড্রাইভারসহ। আলিগড়, মুশুরি, দেউবন্দ, কুতুব মিনার, রেডফোর্ট এবং আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করলাম। গাড়ি ও ড্রাইভার একই ছিল। এই কয়েকদিনের মধ্যে ড্রাইভারের সাথে বেশ সখ্যতা হলো। সে এক সময় বললো, স্যার আপনার সাথে একটা কথা বলি?
বললাম, বলো।

সে বললো, স্যার আমি এই জীবনে অনেক পর্যটনকারী বহন করেছি। তাদের সাথে থেকেছি। গোটা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছি। কিন্তু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েও আপনার বিনয়ী স্বভাব দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ। আমার জীবনে এমন আর কারো দেখা হয়নি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আমি আপনাকে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ করতে চাই।

বললাম,তোমার সাহচর্য এবং আচার ব্যবহার আমারও অনেক ভালো লেগেছে। তোমার কথা আমারও মনে থাকবে। তোমার বাসায় গিয়ে ঝামেলা করার দরকার নেই। চলো, এখানে বসেই ভালো কিছু খাই।

সে বললো, আপনি যদি আমার বাসায় যান, তা হলে সেটি হবে আমার বড় পাওয়া। জীবনের বড় স্মৃতি।
ভাবলাম, একজন মানুষকে যদি একটু আনন্দ দেয়া যায় তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে।
বললাম, চলো।

সন্ধ্যায় তার ছোট্ট ঘরে গেলাম। আমি তাকে বলেছিলাম, শুধু যাবো, আর কিছু না। কিন্তু সে আমার অজান্তেই ফোন করে তাদেরকে বলে দিয়েছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, রান্না করা হয়েছে। ভর্তা, সবজি, ভাত এবং শোল মাছের মতো কি একটা মাছ।

তার বউ মারা গেছে। ছোট দুটি সন্তান। আর আছে বৃদ্ধ মা ও বোন। সন্তান দুটিকে ডেকে কোলে নিলাম। কিছু একটা দিলাম। খেলাম এক সাথে।
তার কী যে আনন্দ!
অনুভূতি শুধু অনুভব করা যায়।

লিচুর জুস

লোকটি সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে থাকে। বিদেশেই তার সাথে দেখা ও পরিচয়। সে বলেছিল, সে রিয়াদে চাকরি করে। কিন্তু চাকরি ছেড়ে সে ব্যবসা করতে চায়। ব্যবসা হলো বাংলাদেশ থেকে বাঙালিদের উপযোগী খাবার আমদানী করা এবং রিয়াদে বিক্রয় করা। তার মধ্যে রয়েছে মুড়ি, মসলা ইত্যাদি। সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা।

গতকাল সে আমাকে ফোন করেছে। বললো, আমি ঢাকায় আছি। আপনার সাথে দেখা করতে চাই। তাকে সময় দিলাম। এলো। বললো, ব্যবসা ভালো হচ্ছে। আরো বললো, সে ব্যবসা আরো বাড়াতে চায়। সে লিচুর জুস বানাবার কারখানা করতে চায়। বাংলাদেশে জুস বানানো হবে এবং তা রিয়াদ নিয়ে বিক্রয় করা হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, লিচুর জুস কি আসল লিচু থেকে বানানো হবে, নাকি লিচুর পাউডার দিয়ে বানানো হবে।

সে হেসে বললো, তার কোনোটাই না। বরং শুধু কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি হবে। বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল একটা নির্দিষ্ট অনুপাত অনুযায়ী মিলিয়ে দিলে তা লিচুর জুসের মতো হয়ে যাবে এবং তাই লোকেরা খাবে।

আমি বললাম, এটা তো হবে মানুষকে বিষ খাওয়ানো!

সে বললো, আমি তা করি বা না করি, কেউ তো তা করবেই। অনেকে তা করছেও। এ থেকে প্রচুর লাভবান হচ্ছে।

ভাবলাম, আমরা কতো বিষ খাচ্ছি, কে জানে! বিষ খাইয়ে কতো মানুষের কতো আনন্দ, তা-ই বা কে জানে!

চাকরানী বউ

মেয়েটি কনজারভেটিভ পরিবারের। এমন পরিবারের মেয়েরা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই একজন স্বামীকে স্বপ্ন দেখে। তার কল্পনার স্বামী তার মন, মগজ, চিন্তা চেতনা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তার কল্পনার যুবরাজ একজনই; অন্য কারোর চিন্তা মনে আসে না। এরপর বিয়ে হয়ে গেলে সেই স্বামীকে আনন্দ দিতে এবং সেবা দিতে গিয়ে সব বিলিয়ে দেয়। এই মেয়েটিও তাই।

খাবার টেবিলে এই মেয়েটি তার স্বামীকে নিজ হাতে সব উঠিয়ে দেয়। স্বামীকে খুশি রাখার জন্য তার চেষ্টার শেষ নেই। স্বামী যখন বাইরে যায় তাকে আদর ও প্রেম দেয়। আসার সময় হলে বাইরে তাকিয়ে থাকে। এভাবে চলে সুখের সংসার। সন্তান হয়। একটা হয়, তারপর আরেকটা। এভাবে সাতটি সন্তান হয়। কিন্তু এই সাত সন্তান জন্ম দিতে তার আকর্ষণ কিছুটা কমতেই পারে।

লোকটি সম্পর্ক গড়ে তোলে বাড়ির যুবতি চাকরানীর সাথে। স্ত্রী বাধা দেয়। কিন্তু তাকে মারধর করে। চলে চাকরানীর সাথে সম্পর্ক। এরপর তার সুন্দরী বউয়ের উপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। এমন নির্যাতন যে তার পক্ষে স্বামীর বাড়িতে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তার পিতা মাতা এমন অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে যায়।

লোকটি তখন মহা আনন্দে চাকরানীকে বিয়ে করে। ঢাকাতে লোকটির একটু জমি ছিল। তা চাকরানীর নামে লিখে দেয়। ডেভেলপারকে দিয়ে সেখানে এপার্টমেন্ট হয়। তার মালিক তার চাকরানী বউ। এতে তার আগের বউ এবং সন্তানদের অংশ নেই।

ভারছি, ধর্মীয় মূল্যবোধ কি সংসারটিকে বাঁচাতে পারতো!

রাতে যদি চাও

চীন দেশের বেশ কয়েকটি শহর ঘুরে দেখার জন্য একটা ট্যুর প্যাকেজ নিয়েছিলাম। সেই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের সব ব্যবস্থা, হোটেল এবং প্রতি শহরে ট্যুর গাইড।

বেইজিং শহরে ট্যুর গাইড ছিল একটি মেয়ে। চীনারা তেমন ইংরেজি বলতে পারে না। কিন্তু সেই মেয়েটি ইংরেজিতে ছিল পাকা । সারা দিন সাথে ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখালো। রাত্রে হোটেলে নিয়ে এলো। যাওয়ার সময় একটু মুচকি হাসলো। মিষ্টি হাসিই বলতে হয়। আর একটি চিরকুট হাতে দিয়ে বললো, রাতে যদি চাও তা হলে এই নাম্বারটিতে ফোন দিও।

জুতো চুরি পার্টি

সেদিন উত্তরার সাত নম্বর সেক্টরের সেন্ট্রাল মসজিদে জুম'আর নামায পড়লাম। নামায শেষে ফিরে দেখি জুতোগুলো নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো। জুতো নেই। ভাবলাম, হয়তো এক স্থানে রেখে অন্য স্থানে খুঁজছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জুতো ছাড়াই দরজায় বেরিয়ে গেলাম। দেখি, আরো বেশ কয়েকজন জুতো হারিয়েছে।

আমাদের কয়েকজনকে জটলা পাকিয়ে জুতো খুঁজতে দেখে মুয়াজ্জিন এগিয়ে এলেন। সব শুনে তিনি বললেন, বছরে কয়েকবার এই মসজিদে জুতো চুরি পার্টি আসে। সাধারণত কোন নামাযে অথবা কোন জুম'আর নামাযেও এখানে জুতো চুরি হয় না। কিন্তু বছরে কয়েকবার একটা জুতো চোর পার্টি আসে এবং তারা মসজিদের বিভিন্ন স্থানে নামাযের অভিনয় করে দাঁড়িয়ে যায় এবং সুযোগ বুঝেই ভালো ভালো জুতোগুলো নিয়ে কেটে পড়ে।

ভাবলাম, অনেক ধরনের পার্টিই তো হয়। এবার জুতো চুরি পার্টি হলো। মন্দ কি।

বড় মনের কৃষক

জর্ডানের মৃত সাগর দেখে ফিরছি। মূল সড়কে যাওয়ার পথে তরমুজ, হানিডিউ ও অন্যান্য ফলের ক্ষেত। ফসলি জমির ভিতর দিয়ে লম্বা পথ। মাঝপথে চৌরাস্তা। ড্রাইভার থমকে দাঁড়ালো। কোন্ পথে যাবে? ডানে, বাঁয়ে, নাকি সোজা?

একটু দূরেই দেখা গেলো এক কৃষক তার ছোট্ট ট্রাকে জমি থেকে ফল উঠাচ্ছে। তাকে পথ জিজ্ঞেস করা হলো। সে বললো, আমি এক্ষুণি আসছি, আমিও সেদিকে যাবো, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো।

কিছুক্ষণ পরেই সে ট্রাক নিয়ে এলো। এসেই তার ট্রাকের সবচেয়ে বড় তরমুজটি আমার ড্রাইভারের হাতে তুলে দিলো। কোন মানা শুনলো না। বললো, আমি এতো ফল নিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি খালি হাতে যাবে, তা কি করে হয়!

ফেসবুক

ফেসবুকের ম্যাসেঞ্জারে একদিন একটি সুন্দরী মেয়ে আমাকে নক করলো। বললো, স্যার আমি আপনার একটু সাহায্য চাই।

বললাম, কি সাহায্য করতে পারি?

সে তার কথাগুলো লিখে জানালো। সারমর্ম হলো, এই ফেসবুকেই এক ছেলের সাথে তার যোগাযোগ হয়। যোগাযোগ হতে হতে গড়ে উঠে সম্পর্ক । সাত বছর ধরে চলে এই গভীর সম্পর্ক। প্রতি সপ্তাহে দুই একদিন তারা এক সাথে রাত কাটায়।

আমি বললাম, তা হলে তোমরা তো বেশ আনন্দেই আছ। আবার কি সাহায্য প্রয়োজন?

সে বললো, আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে সাত বছর সম্পর্ক রাখার পর এখন অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার সাথে সে সংসার করে। এরপর অনেক চেষ্টা করে তার সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়েছি। কিন্তু ইদানিং সে আমাকে ছেড়ে অন্য আর একটি মেয়ের সাথে রাত কাটাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি করতে পারি?

সে বললো, আপনি সমাজের একটি ভালো অবস্থানে আছেন। শুনেছি, আপনি মানুষের অনেক উপকার করেন। আপনি হয়তো আমাকেও একটু সাহায্য করতে পারেন। তাদের সেই সম্পর্ক শেষ করে একটু বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলে খুব কৃতজ্ঞ হবো।

বললাম, যে ছেলেটি ফেসবুকের মাধ্যমে এক মেয়ে ছেড়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে, তাকে বিয়ে করে তুমি কতটুকু শান্তি পাবে!

মেয়েটি বললো, আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি। সাত বছর পর্যন্ত তার সাথে রাত কাটিয়েছি। তার ঘরের কাজ করে দিয়েছি। এমনকি বাথরুম পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছি। এখন এই অবস্থা!

আমি বললাম, ফেসবুকের মাধ্যমে এক অজানা ছেলের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপন কি ঠিক হয়েছে?

তারা মিয়া

তারা মিয়া রিক্সা চালায়। সারা দিন রিক্সা চালিয়ে যা পায়, তার অর্ধেক দিয়ে সংসার চালায়। বাকি অর্ধেক এলাকার গরীব ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করে। একবার ঢাকার একটি বড় প্রতিষ্ঠান তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্বর্ধনা দিলো এবং এক লক্ষ টাকার চেক দিলো। এর কিছু দিন পর গ্রামের এক শুভাকাঙ্ক্ষী তার বাড়ি এসে বললো, এ টাকাগুলো খরচ না করে ব্যাংকে স্থায়ী আমানত রাখো। তাতে প্রতিমাসে যা পাবে, তা দিয়ে সংসার চলবে।

তারা মিয়া জবাব দিলো, আমি তো গরীব শিশুদের জন্য তা ব্যয় করে ফেলেছি।

আজ নেত্রকোণার এক গারো পাহাড় সফরে গিয়ে তার সাথে দেখা হলো। ভালো লাগলো।

ভাবলাম, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে আরো অনেক তারা মিয়া প্রয়োজন।

চীনা কৌশল

বেইজিং শহরে এক বিকেলে ঘুরছি। ঢাকার মতোই পথেঘাটে এবং ফুটপাথে লোকজনকে নানা জিনিস বিক্রয় করতে দেখলাম। সামনে দেখলাম, একটা লোক কিছু খেলনা নিয়ে বসে আছে। আনাস একটা খেলনা চাইলো। দাম জিজ্ঞেস করে খেলনাটি নিলাম। আমার নিকট ছোট কোন নোট না থাকায় বড় একটা নোট দিলাম। বিক্রেতাটি নোটটা নিয়ে সামান্য একটু নাড়াচাড়া করেই বললো, নোটটি ছেঁড়া। আমি একটু বিস্মিত হলাম। এটা তো ছেঁড়া ছিল না। যাই হোক, ছেঁড়া নোটটি ফেরত নিতে হলো। পরে আরেকটি নোট দিলাম। সেটাও বড় নোট। বিক্রেতা সেই নোটটি গ্রহণ করলো এবং বাড়তি পয়সা ফেরত দিলো। আমরা চলে এলাম।

পরে আমি আরেক দোকানে গেলাম। দোকানদারকে বিকেলের বিক্রেতার ভাংতি নোটটি দিলাম। দোকানদার বললো, এই নোট নকল। মনে সন্দেহ হলো। এরপর আমি বিকেলের ছেঁড়া নোটটি দেখালাম। সে বললো এটাও নকল। আমি দোকানদারকে বিকেলের ঘটনাটি বললাম। দোকানি বললো, যে বিক্রেতা থেকে তুমি খেলনা কিনেছো, সে অতি কৌশলী। তোমার নোট ঠিকই ছিল। কিন্তু সে কৌশলে তার ছেঁড়া নকল নোট বদল করে আসল নোট রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ আমার প্রথম ভালো নোটটি সে সুকৌশলে হরণ করে নিলো। এরপর আরেকটি ভালো নোট নিলো। আর যে ভাংতি ফেরত দিলো তাও নকল।

চীনারা কৌশলে কতো পাকা, তা দেখে অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

নিজেকে বিয়ে

আজ পত্রিকায় একটি মজার খবর দেখলাম। কোন এক পশ্চিমা দেশের একটি মেয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজকে বিয়ে করেছে। বিয়ের সাজে সেজেছে, বিয়ের কাপড় পরেছে। বন্ধুবান্ধব এসেছে, পার্টি হয়েছে। বিয়েতে যতো আনন্দ হয়, আনুষ্ঠানিকতা হয়, সবই হয়েছে। ঘটা করে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। সে নিজেই বর । নিজেই কনে। বিয়ে করেছে নিজকেই।

তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি মেয়ে হয়ে এই বর কেন নির্বাচন করলে?

সে উত্তর দিয়েছে, আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তাকেই আমি বিয়ে করলাম। অন্য আরেকজনকে বিয়ে করলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তার সাথে নিজকে খাপ খাওয়াতে হয়। সে কী পছন্দ করে আর কী পছন্দ করে না, তাও খেয়াল রাখতে হয়। এতো ঝামেলার কি দরকার? তাই আমি নিজকে বিয়ে করেছি।

মেয়েটি আরো বললো, ঝামেলা শেষ। পরিবারে একা থাকতে হবে তেমন কথাও তো নয়। সঙ্গ দেওয়ার জন্য আছে বিড়াল, কুকুর। আর আনন্দের জন্য বন্ধুর অভাব হবে না।

দুনিয়া

অস্ট্রেলিয়ার এক বড় বিশ্ববিদ্যালয়। তাতে আছেন মিশরের এক অধ্যাপক। স্কলার হিসেবে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন করেন। নিজেও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই সুবাদে তাঁর সাথে পরিচয়। এবং অনেকটা ঘনিষ্ঠতা। তিনি অনেক সম্পদের মালিক। অস্ট্রেলিয়ার এক বিরাট ভূ-সম্পত্তির স্বত্ত্বাধিকারী। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। সন্তান আছে দুপক্ষেরই।

তাঁর বয়স হয়েছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হয়ে গেছেন। তাতে সৃষ্টি হলো মেলা সমস্যা। দুই বউ এবং তাদের সন্তান, তাঁর ভাই এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয় সবাই তাঁর সম্পদ নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আইনী লড়াই লড়ছেন। এই পণ্ডিত ধনাঢ্য ব্যক্তিটি মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে এক বৃদ্ধাশ্রমে আছেন। আর তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন লড়াই করছে তাঁর সম্পত্তির বড় ভাগটি নেওয়ার জন্য।

ভাবছি, দুনিয়ার এতো অর্জনে কি লাভ?

আনন্দ দেয়ার আনন্দ

আমরা ইন্ডিয়ার আলিগড় থেকে মুশুরের দিকে যাচ্ছি। অনেক লম্বা পথ। পথের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে চা-নাস্তা খাওয়ার ছোট ছোট ঘর। কুঁড়ে ঘরের মতো। এগুলোর একটা নাম আছে। নাম হলো ডাবা। একটাতে নামলাম। বসলাম। চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য অর্ডার দেয়া হলো। খাবারও এলো। পিছনে তাকিয়ে দেখি একটা কুকুর ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি ডাবার বয়টিকে জিজ্ঞেস করলাম, কুকুরটি কি চায়?

এরই মধ্যে দোকানি এসে কুকুরটিকে বললো, তুই চলে যা। কোন ধমক দিলো না, আঘাতও করলো না। কিন্তু কুকুরটি আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলো।

চা খাচ্ছি পনের বিশ মিনিট হবে। তারই মধ্যে তাকিয়ে দেখি দুর থেকে কুকুরটি আবার তাকিয়ে আছে। ইশারা করে ডাকলাম। কুকুরটি এলো। বয়টিকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কুকুরটি কি চায়?

বললো, রুটি চায়।

দিলাম। কিন্তু সে রুটিটি খেলো না। বরং তাকিয়ে আছে। এরই মধ্যে দোকানি আবার এলো। বললাম, সে কি চায়?

বললো, সে ঐ বিস্কুটটি বেশি পছন্দ করে।

বললাম, নিয়ে আসো। আমি পয়সা দিবো।

নিয়ে এলো। প্যাকেটটি খুলে বিস্কুটগুলো দেয়া হলো। কুকুরটি অতি আনন্দে সেগুলো খেয়ে আমার দিকে তাকালো। একটু লেজ নাড়লো। মনে হলো যেনো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আমিও চোখের ইঙ্গিতে তাতে সাড়া দিলাম। কাউকে একটু আনন্দ দেয়া কতই না আনন্দের।

বাহাই

দিল্লির লোটাস ট্যাম্পল দেখতে গেলাম। এটি একটি মন্দির। দূর থেকে মনে হয় সাদা রং-এর একটা শাপলা ফুল। খুবই সুন্দর। অনেক পর্যটক ভীড় করে লাইন ধরে ঢুকছে। আমিও গেলাম।

লাইন ধরেই যেতে হলো। কাছে যাওয়ার পরেই এক নারী কণ্ঠ এই মন্দিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আচরণ বিধি বলে যাচ্ছিলেন। বললেন, এটা বাহাই সম্প্রদায়ের উপাসনালয়। এখানে সকল ধর্মের লোকজন এসে তাদের নিজ নিজ রীতি নীতি অনুযায়ী উপাসনা করতে পারে।

ঢুকলাম। সেখানে বসার স্থান আছে। সামনে উন্মুক্ত জায়গা। যে যার ইচ্ছা মতো, তার নিয়ম অনুযায়ী উপাসনা করতে পারে। পরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম, সেখানে এক সাদা ভদ্র লোক। কাছে গেলাম। বললো, আমি আমেরিকান। আমেরিকার শিকাগোতে বাহাই উপাসনা কেন্দ্র আছে। আমি সপ্তাহখানিকের জন্য এখানে এসেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বাহাই?

বললেন, হ্যাঁ, আমি বাহাই।

তাকে বাহাই ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বাহাউল্লাহ ছিলেন একজন নবী। তিনি অন্যান্য নবীদের ধারাবাহিকতায় এসেছেন। তিনি নবীদের কয়েকটি নাম বললেন। যাদের অন্তর্ভুক্ত হলো ইব্রাহীম (আ), মুসা (আ), ঈসা (আ), মুহাম্মদ (সা) এবং সর্বশেষে বাহাউল্লাহ।

তিনি আরো বললেন, গড একজনই। তিনি বিভিন্ন সময় ম্যাসেঞ্জার (রাসূল) পাঠিয়েছেন। তাঁরা সত্যের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু পরে মানুষ সেগুলোকে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত করেছে। সবই একই উৎস থেকে আসা এবং সবই এক। আমরা সবগুলোতেই বিশ্বাসী।

পাশের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম ধর্মে আল্লাহ হলেন এক, আর কোন কোন ধর্মে ভগবান হলেন অনেক। তা হলে এই এক এবং অনেক একসাথে কিভাবে ঠিক হতে পারে? এক ঠিক হলে অনেক হবে ভুল। আর অনেক ঠিক হলে এক হবে ভুল।

তিনি বললেন, উৎস তো একই। পরে যদি কেউ কিছুটা পরিবর্তন করে নেয় তা হলে উৎসের তো দোষ নেই। উপাসনার উৎস তো গডের।
ভাবলাম, ঠিকই তো! উৎস গডের উৎস আদর্শ ধারণ করলেই তো হয়ে যায়।

ককপিট

কুয়ালালামপুর থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে যাচ্ছি। বিমানে আছি। নিচে সাগর। আনাস বললো, একটু ককপিটে যাওয়া যাবে?

জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

বললো, আমি তো বিমানের সবকিছু নিয়ে একটু বুঝতে চেষ্টা করছি, তাই। ইউটিউব এবং ইন্টানেট দেখে জানতে চেষ্টা করছি বিমান কি করে চলে। বিমান উড্ডয়নে কি করতে হয়। এয়ারপোর্টে গিয়ে ল্যান্ডিং এর জন্য কি করতে হয়। মোটামুটি জানতে পেরেছি। এখন ককপিটে গিয়ে যদি একটু দেখতে পারতাম ভালো হতো।

আমি ছোট একটা চিরকুট লিখে বিমানবালাকে দিলাম, পাইলটকে দেওয়ার জন্য। লিখলাম, এখানে দশ বছরের একটি ছেলে আছে, বিমান চালনা সম্পর্কে তার প্রচুর কৌতূহল। ককপিটে আসতে চায়। এটা কি সম্ভব হবে? বিমান বালা ফিরে এসে বললো, বিমান চলার সময় অন্য কাউকে ককপিটে ঢুকানো আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ। পাইলট বলেছেন, এয়ারপোর্টে বিমান নামার পর তাকে সেখানে নেয়া হবে।

বিমান এয়ারপোর্টে থামলো। ভালো লাগলো যে, পাইলট তার কথাটি ভুলে যাননি। তিনি বিমান বালাকে দিয়ে আনাসকে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সাথে আমিও গেলাম। পাইলট তার পাশে আনাসকে বসালেন। জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, সে কি জানতে চায়, কতটুকু জানতে চায়। আনাস ককপিটের এক একটা জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে নিজেই বলতে লাগলো, এটা দিয়ে এই হয়। এটা এমন করলে বিমান উপরে যায়, আর এমন করলে নিচে নামে। এমন করলে ডানে যায়, আর এমন করলে বাঁয়ে যায়। প্রায় পনেরো বিশ মিনিট এমন আলাপ হলো। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে শুনলাম। পরে পাইলট পিছনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাকে তো তাগেই ককপিটে নিয়ে আসলে ভালো হতো। সেই বিমান চালাতো, আমরা বসে দেখতাম।

ভালো লাগলো, আনাস বিমান চালনা সম্পর্কে জানার অনেক কৌতূহল রাখে। সে বলে, আমি পাইলট হতে চাই।

ভাবলাম, মানুষের যদি কৌতূহল থাকে এবং জানতে চায় তা হলে হয়তো অসম্ভব কিছুই নেই।

সুন্দরী বউ

আমার এক নর্থ আমেরিকান সহপাঠির কথা। এক সাথে আমরা লেখাপড়া করছি। আমাদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হয়। সে দেশের সংস্কৃতি, জীবন-যাত্রা, চলাফেরা, আনন্দ-ফূর্তি সবকিছু। ছাত্র অবস্থায় সে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রী পেয়ে অত্যন্ত খুশি। খুশি হওয়ার অনেক কারণ আছে। একটি কারণ হলো স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া।

মানুষ তার কথা ও অভিমতের পক্ষে যুক্তি দিতে চেষ্টা করে। আমার বন্ধুটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সে বিভিন্ন ভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলো তার বউটি অত্যন্ত সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া। এর প্রমাণ হিসেবে সে বললো, তার এই বউটি দশ বছর বয়সে ধর্ষিতা হয়েছে। অর্থাৎ এখান থেকেই বুঝা যায়, সে কতো আকর্ষণীয়া। তার প্রতি ছেলেদের কতো আগ্রহ ও আকর্ষণ। এখানেই শেষ নয়। সে আরো বললো, তার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে বহু ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। অর্থাৎ অনেকেই তার সাথে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে। এটাও প্রমাণ করে, সে কতো আকর্ষণীয়া এবং ছেলেরা তাকে কতো চায়।

এমন একটি মেয়ের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে, এটা তার কতই না গর্বের বিষয়!

ব্যাংক ব্যালেন্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত নাম করা এক অধ্যাপক। ঢাকায় তার দুটি বহুতলা বিশিষ্ট ভবন আছে। এই দুটি ভবনে রয়েছে অনেক এ্যাপার্টম্যান্ট। সবগুলোই ভাড়া চলে। বড় অংকের টাকা পান। বয়স অনেক। এ বয়সে মানুষ ঘরে বসে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটিতে বসেন এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভাতা পান, যা তার অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত নগণ্য। তিনি গাড়ি ও ড্রাইভার রাখতে পারেন। কিন্তু চড়েন বাসে। তার কাপড়গুলো দেখলে মনে হয়, যেনো অভাবেই আছেন।

একদিন রসিকতা করে বললাম, একটা গাড়ি কিনলে কেমন হয়?

বললেন, গাড়িতে এতো টাকা ব্যয় করবো?

বললাম, এতো টাকা সঞ্চয় করে লাভ কি?

বললেন, ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি থাকলে ভালো লাগে।

প্রধান অতিথি

আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও সেমিনারে বিভিন্ন ধরনের সেশন হয়। কিছু সেশন হয় সবাইকে নিয়ে। যেমন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপর সাধারণত অনেকগুলো প্যারালাল সেশন হয়। অর্থাৎ একই সময় বিভিন্ন হলে বা বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন সেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

এই কনফারেন্সে প্রধান সেশনটিতে গেলাম। সাধারণত পেছনের ব্যানার বা ব্যাক ড্রপে প্রধান অতিথি এবং অন্যদের নাম লেখা থাকে, ছবি থাকে না। কিন্তু এখানে একটু ব্যতিক্রম দেখতে পেলাম। সে অনুষ্ঠানে যারাই ডায়াসে উপবিষ্ট হবেন তাদের সবার ছবি দেয়া হলো একটি সারিতে। আর প্রধান অতিথির ছবি দেয়া হলো তাদের উপরে অন্য সারিতে, একা।

হলের ভিতরে ঢুকে ভালো লাগলো। প্রধান অতিথির স্থানে আমার ছবি রয়েছে এবং নিচে লেখা আছে আমার নাম এবং প্রধান অতিথি। ভালো লাগলো। লজ্জাও লাগলো। কারণ, এখানে অনেক পণ্ডিত আছেন, যারা প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য আমর চেয়ে বেশি যোগ্য।

এই কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করছেন বিশ্বের অনেক দেশের স্কলার, প্রফেসার এবং গুণীজন। এই প্রধান অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধগুলির মান অত্যন্ত ভালো ছিল। সাধারণত এই ধরনের সেশন দুই ঘণ্টা হয়। কিন্তু এই প্রধান সেশনটি ছিল তিন ঘণ্টার। প্রধান অতিথি হিসেবে আমি দাঁড়ালাম শেষ দিকে। একটু হালকা করবার জন্য একটা চুটকি বললাম। মনে হলো সবাই চুটকিটা পছন্দ করেছেন। বিকট হাসির প্রতিধ্বনি হলো গোটা হলে। এরপর আমি কথা বললাম প্রায় আধা ঘণ্টা।

সেশন যতো দীর্ঘই হোক, বক্তব্য ও বিষয়বস্তু যদি আকর্ষণীয় হয় তা হলে মানুষ মজা পায়।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটি স্মরণীয় হয়ে রইলো মনের কোঠরিতে।

মা ও বউ

সন্তানের জন্য মা সবকিছু উজাড় করে দিতে পারেন এবং দেন। এমন অনেক কাহিনী শুনেছি, বইয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার নিজ চোখে দেখা এক মায়ের ত্যাগ দেখে অনুভব করা যায়, আল্লাহ মা'কে কেমন হৃদয় দিয়ে তৈরি করেছেন।

মেয়েটিকে আমি চিনি। বিয়ে হয়েছে। একটি পুত্র সন্তানও হয়েছে। কিন্তু স্বামীর স্বভাব চরিত্র অন্য ধরনের। শেষ পর্যন্ত বিয়ে টিকেনি। মেয়েটি চলে আসে বাপের বাড়ি। তার স্বামী পুত্রসন্তানের দায়িত্ব নেয়নি। সন্তানের দায়িত্ব মেয়েটির উপর পড়ে। মেয়েটির বাপ মা তাকে আবার বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করে। কিন্তু সে বলে আরেক স্বামীর নিকট গেলে এই সন্তানের কি হবে? তাকে সেখানে নিয়ে গেলেও তার অনেক কষ্ট হবে। সে বিয়ে করলো না। বাপের বাড়িতেই রয়ে গেলো।

নবযৌবনা এই মেয়ের আর বিয়ে হলো না। তার জীবন যৌবন সব দিলো ছেলের জন্য। ছেলে লেখাপড়া করলো। প্রেম করে বিয়ে করলো। বিয়ে করার পর সেই ছেলে তার মাকে বাসায় নিয়ে এলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছেলের বউ ছেলেটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। একদিন শুনলাম। সেই ছেলে তার মাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভাবলাম, এই বউয়ের সন্তানও যদি ভবিষ্যতে এমন করে তা হলে কেমন হবে!

পর্যটকদের সাথে কিছুক্ষণ

দিল্লির রেডফোর্টের ভিতরে ঘুরে ঘুরে দেখছি। শেষ প্রান্তের আবাসিক প্রাসাদগুলোর সামনে ছিল বড় সবুজ মাঠ। সেখানে এদিক সেদিক দলে দলে পর্যটকরা বসে আছে।

একটা গ্রুপ মনে হলো অনেক বড়। তাদের গায়ে কিছুটা ভিন্ন ধরনের পোশাক ছিল। গাইডকে নিয়ে আমি সে দিকেই গেলাম। তাদের সাথে বসে গেলাম। সেখানে আসাম ও মিয়ানমারের পর্যটকরা ছিল। কথা বললাম। তারা আমার পরিচয় পেয়ে অনেকে ছবি উঠালো। এরপর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের সামনে কিছু কথা রাখলাম। এই দুনিয়াতে আমাদের জীবন এবং দায়িত্বের কিছু কথা বললাম। চলার পথে একে অপরের সাথে আচরণের কথা বললাম। আরো বললাম মানুষে মানুষে সুসম্পর্কের বাধ্যবাধকতার কথা।

সব শেষে বললাম, আমরা সবাই এক। অন্যের উপর নির্যাতন বা জুলুম চালানো মোটেই ঠিক নয়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কথাগুলো কি ঠিক?

তারা বললো, আপনি ঠিক বলেছেন।

আমি বললাম, আমরা কি এই ওয়াদা করতে পারি যে, অন্যের সাথে ভালো ব্যবহার করবো। কারো উপর নির্যাতন চালাবো না। কাউকে হত্যা করবো না।

তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা পারি।

আমি বললাম, তা হলে আমরা সবাই কি দু'হাত উঁচু করে এই প্রতিজ্ঞা করতে পারি?

সবাই বললো, হ্যাঁ।

তখন আমরা সবাই দুহাত উঁচু করে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমরা কেউ কারো উপর নির্যাতন চালাবো না। কাউকে হত্যা করবো না, কারো উপর অত্যাচার করবো না।

ভাবলাম, যারা জীব হত্যা মহাপাপ বলে, তারাই মিয়ানমারের রাখাইনে কীট পতঙ্গের মতো মানুষ মারছে। রেডফোর্টের এ কথাগুলো যদি সে পর্যন্ত যায়, তবে কতই না ভালো হতো!

আগের স্যার গরু

হোটেলের নাম 'পপুলার'। বখশী বাজারে মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের পাশেই তা অবস্থিত। এর অধিকাংশ গ্রাহক মেডিকেলের শিক্ষার্থী। একদিন ডিনার করলাম সেখানে। খেয়ে দেয়ে সবাই ক্যাশিয়ারের নিকট খাবারের দাম দিচ্ছে। এক 'হোটেল বয়' হাক ছেড়ে বললো, 'আগের স্যার গরু আর পরের স্যার ছাগল'।

ভাবলাম, এবার বয়টির বারোটা বাজবে। বুঝতে পারবে, গ্রাহককে এমন কটূক্তি করার মজা কেমন। আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে পাশের লোকটি বললো, ও কিছু না। হোটেল বয়টি ক্যাশিয়ারকে বলে দিয়েছে, আগের স্যার গরুর গোশত খেয়েছেন, কাজেই তার নিকট থেকে সে মূল্যই নিতে হবে। আর পরের স্যার খেয়েছেন খাসির গোশত। কাজেই আগের স্যার গরু, আর পরের স্যার ছাগল।

ভাবলাম, বেশ তো। কথার অর্থ বুঝতে হলে ভাষার রীতি বুঝতে হয়।

পণ্য বিক্রয়ের মজার কৌশল

একদিন আমার কানাডার বাসায় বসে আছি। ফোন বাজলো। অপর পার থেকে নারী কণ্ঠ।

বললো, তুমি ভাগ্যবান। আমরা মাঝে মাঝে কিছু ব্যাক্তিকে বাছাই করি এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করি। তোমাকে একটা প্রশ্ন করা হবে। তুমি যদি সঠিক জবাব দিতে পারো তা হলে তোমার জন্য রয়েছে সুন্দর একটা পুরস্কার।

বললাম, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো।

প্রশ্ন করলো, কানাডার রাজধানীর নাম কি?

বললাম, এটি তো অনেক সোজা প্রশ্ন। উত্তর দিলাম।

নারীটি বললো, তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে। তুমি পুরস্কার পাবে। কখন আমি পুরস্কারটি নিয়ে আসতে পারি?

একটা সময় দিলাম। সে সময় মতো এসে উপস্থিত। আমাকে একটা সুন্দর উপহার দিলো। আর বললো, আমি যখন এসেছি তা হলে আরেকটা সুন্দর জিনিস তোমাকে দেখাই। এই বলে সে আরেকটি পণ্য বের করলো, যা দেখতে আকর্ষণীয় বটে। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই।

কানাডার মতো দেশে কারো বাড়িতে ঢুকে পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা করা কঠিন। তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান। আপনজন ছাড়া কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু এই নারীটি কৌশলে ঢুকে গেলো।

ভাবলাম, পণ্য বিক্রয়ের কৌশলটি তো মজার!

টাকা জলে ঢালা

আমার মেয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে থাকে। সে সপরিবারে ঢাকায় এসেছে, বরের বন্ধুর বিয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য। এই বিয়ের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান। প্রথম, যারা বিদেশ থেকে মেহমান এসেছে তাদের জন্য মহা আড়ম্বরের সাথে একটা অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়, হলুদ। তৃতীয়, বিয়ে। চতুর্থ, বৌ ভাত। এছাড়া আরো কিছু আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। যারা বিদেশ থেকে এসেছে তাদেরকে রাখা হয়েছে ওয়েস্টিন হোটেলে। গাজীপুরে হলুদ। সেই হলুদের জন্য মেহমানদেরকে ওয়েস্টিন থেকে হেলিকপ্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গাজীপুরে এক রাজকীয় প্রাসাদের মতো হাবিলি তেরি করা হয়েছে এই জন্য। রান্না করার জন্য রাঁধুনী আনা হয়েছে বোম্বে থেকে। পরিবেশনকারী আনা হয়েছে ইন্ডিয়া থেকে। নাচ ও গানের জন্য শিল্পীদেরকে আনা হয়েছে বোম্বের বলিউড থেকে।

হলুদ থেকে আসার পর আমার মেয়ে ও তার বর বললো, এ যেনো লোক দেখানোর জন্য পানিতে টাকা ঢেলে দেওয়া। কয়েক কোটি টাকা জলে ঢালা।

এটি হলো মেয়ে পক্ষের আয়োজন। মেয়ে হলো বাংলাদেশের তিনটি অত্যাধুনিক হসপিটালের একটির মালিকের কন্যা।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এক হলুদের জন্য এই টাকাগুলো খরচ না করে যদি মিডিয়াতে ঘোষণা করে দেয়া হতো যে, তার হসপিটালে এক সপ্তাহের জন্য গরীবদেরকে ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হবে, তা হলে লোক দেখানোও হতো, আর বহু মানুষের মুখে হাসি ফোটানোও যেতো।

বয়স আঠারো

ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবায় লেখাপড়া করছি। একটা কোর্সের জন্য আমাকে গবেষণামূলক প্রজেক্ট লিখতে হয়েছে। সেজন্য আমি ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যাতে সে দেশের সামাজিক অবস্থার অনেক কিছু বেরিয়ে এসেছে। একটি বিষয় এখানে বলছি।

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সে দেশের সন্তানরা আঠারো বছর বয়স হলে পিতামাতা থেকে বেরিয়ে আসে। তারা স্বাধীনভাবে থাকার চেষ্টা করে এবং থাকে। মেয়ে হলে নিজের পায়ে দাঁড়ানো অনেকটা কঠিন হয়ে উঠে। সেজন্য তারা গিয়ে উঠে বয়ফ্রেন্ডের সাথে। আর ছেলেরা একা থাকার পরিবর্তে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকে। তাদের খরচ নির্বাহের জন্য তারা পিতামাতার উপর নির্ভর করে না।

অনেকের মধ্যে একটা ছেলেকে এমন পেলাম, যে এখনো তার পিতামাতার সাথে থাকে। তবে সে বললো, সে পিতামাতার সাথে থাকার জন্য বাড়ি ভাড়া দেয় না, কিন্তু তার বিনিময়ে সে কাজ করে দেয়। কাজটি হলো শীতকালে বাড়ির আঙ্গিনায় এবং পথে যে বরফ পড়ে থাকে, সে তা পরিষ্কার করে এবং তার বিনিময়ে বাসায় থাকে।

পাশ্চাত্য সমাজে আঠারো মানে পিতামাতার সাথে বিয়োগ, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের সাথে সংযোগ।

হাতি

কুরআন, বাইবেল, মহাভারত এবং অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ইতিহাস ও কাহিনী বর্ণিত আছে। সেদিন কুরআনের একটা ছোট কাহিনী সামনে এলো। ভিনদেশী এক বাদশা মক্কার কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য বিরাট হস্তী বাহিনী নিয়ে এলেন। তার নাম বাদশা আবরাহা। তিনি মক্কা থেকে একটু দূরে অবস্থান করলেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, আব্দুল মোতালেব মক্কা নগরীর নেতা। বাদশা এক প্রতিনিধি দল পাঠালেন আব্দুল মোতালেবের নিকট। আব্দুল মোতালেব তার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বাদশার সাথে দেখা করতে এলেন। বাদশা আবরাহা বললেন, আমি তোমাদের কাবা ধ্বংস করতে এসেছি। কারণ আমার দেশে আমি বড় একটা গীর্জা তৈরি করেছি। আমি চাই মানুষ কাবার দিকে না এসে আমার গীর্জাকে তীর্থ স্থান হিসেবে গ্রহণ করুক। সারা পৃথিবী থেকে মানুষ সেখানে আসুক। এটাই আমি চাই। এই কাবা যতো দিন থাকবে ততদিন মানুষ এখানেই আসবে। কাজেই আমি এটাকে ধ্বংস করতে চাই। তোমার কিছু বলার আছে?

আব্দুল মোতালেবের উটের খামার ছিল। বাদশা আবরাহার লোকজন তাঁর খামার থেকে অনেকগুলো উট নিয়ে জবাই করে খেয়ে ফেলেছিলো। আরো কিছু উট নিয়ে রেখেছিল পরে খাওয়ার জন্য। আব্দুল মোতালেব আবরাহার কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ আমার বলার আছে। আপনার লোকজন আমার কিছু উট নিয়ে গেছে। সেগুলো আমাকে ফেরত দিন। বাদশা আবরাহা বললেন, আমি তোমাকে এই জাতির নেতা হিসেবে ভেবেছিলাম। তুমি তো অত্যন্ত স্বার্থপর এবং হীন মানসিকতার মানুষ। তুমি জাতির কথা চিন্তা না করে তোমার উটের কথা বললে!

তখন আব্দুল মোতালেব বললেন, আমি এই উটগুলোর মালিক। কাজেই আমি উটগুলোর কথা বলেছি। যে কাবার কথা আপনি বলছেন, সেই কাবার একজন মালিক আছেন। তিনিই সেই বিষয়টি দেখবেন।

কাবার মালিক বিষয়টি দেখেছিলেনও বটে।

পাই বলেই আসি

আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি মাঝে মাঝেই আমার শহরের বাসায় আসে। এসে তার আর্থিক সমস্যার কথা বলে। একবার আমি ভাবলাম, তার সাথে কথা বলে তার অবস্থা জানতে চেষ্টা করি, যেনো তার জন্য এমন কিছু করে দেয়া যায়, যাতে করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

একসাথে বসে চা খাচ্ছি। আলোচনা করছি। তার পরিবার পরিজন সহায় সম্পত্তি নিয়েই খোলামেলা আলোচনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম তার অনেকই আছে এবং তার নতুন আয়ের উৎস সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

পরে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো মাঝে মাঝেই আসো। আসাটা খারাপ নয়। কিন্তু তোমার যে অবস্থা তাতে তুমি নিজেই তো স্বচ্ছল।

সে বললো, আল্লাহ আমাকে ভালোই রেখেছেন।

বললাম, তোমরা এলে ভালোই লাগে, কিন্তু .....।

সে বললো, আসলে আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এলেই তো কিছু পাই, সেজন্য আসি।

চা-টা

সিডনীর এক শপিং সেন্টারে গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে যাচ্ছি। আনাস অন্য একটি গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বললো, দেখো মজা! একটা গাড়ির নাম 'টয়' (Toy)। হাসতে হাসতে সে বলেই চললো, জানো? এটা কিন্তু Toy না, এটা আসল গাড়ি। Toyota গাড়ি। তবে ঝাকুনী লেগে অথবা ধাক্কা লেগে হয়তো 'Toyota' নামের 'ota' অক্ষরগুলো পড়ে গেছে। বাকি রয়ে গেছে 'Toy'।

সাথে ছিলেন আরেক দেশী ভাই। তিনি বললেন, আমাদের দেশেও এমন হয়। হয়তো কেউ চাঁদার জন্য এসে হাজির হলো। তাকে চা-টা দিতে হবে। আসলে দিতে হবে 'চা-টাকা'। এখানে 'কা' কথাটি উহ্য রাখতে হয়। খাওয়াতে হয় চা, দিতে হয় টাকা। একত্রে চা-টাকা। কিন্তু বলতে হয় চা-টা।

ভাবলাম, মিল তো মন্দ না।

পীর মুরিদি

বাংলাদেশের মাপকাঠিতে তিনি অনেক বড় একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ঢাকায় দুটি বহুতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা আছে। তার অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। আমাকে একবার তিনি তার একটি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। গেলাম। কথা বার্তা শুনলাম। আমার কাছে কোন কোন বিষয়ে অভিমত চাওয়া হলো। পরামর্শ দিলাম। খাওয়া দাওয়া হলো। শেষ পর্যায়ে বুঝতে পারলাম, তিনি শুধু একজন বড় শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী নন। বরং তিনি এক পীরের মুরিদ। শেষ পর্যায়ে তিনি দাওয়াতী কাজও করলেন। আখিরাতে নাজাত পেতে হলে পীরের মাধ্যম ছাড়া বেহেশতে যাওয়া যাবে না। তিনি এক পীরের পরিচয় দেওয়ার জন্য একটা ছোট্ট পুস্তিকা আমাকে উপঢৌকন দিলেন। পকেটে করে তা বাসায় নিয়ে এলাম। একদিন শুয়ে শুয়ে অবসর সময়ে পুস্তিকাটি খুলে দেখলাম। সেখানে কোন পীরের মুরিদ হওয়ার অনিবার্যতা এবং পীরের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে এই সব বিষয়ে সংক্ষেপে লেখা আছে। একটি পৃষ্ঠার লেখা দেখে থমকে গেলাম। লেখা আছে পীরকে কতো সম্মান করতে হবে সে কথা। লেখা আছে, যদি কেউ পীরের সামনে বসে, তা হলে শুধু পীরের দিকেই ধ্যান দিতে হবে। সেখানে আল্লাহর যিকর বা আল্লাহর স্মরণ করাও ঠিক নয়। কারণ, পীরের স্মরণ করাই আল্লাহকে স্মরণ করা। পীরকে স্মরণ করলে আল্লাহকেই স্মরণ করা হয়।

ভাবলাম, আল্লাহর কি কোন শরিক আছে?

মাইকেল জ্যাকশন নাচ

ছেলেটির বয়স পনের কি ষোল হবে। পিতা একজন প্রগতিশীল লোক। সরকারি চাকুরি করেন। দাদা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ হয়েছেন। এক সান্ধ্যকালীন পার্টিতে সেই ফ্যামেলির সাথে দেখা। পার্টিতে ছেলেটি মাইকেল জ্যাকসনের নাচ দেখালো। সবাই বাহ্ বাহ্ দিলো, খুশি হলো, হাততালি দিলো। তার পিতা বেশ খুশি। মাও খুশি।

একদিন তার পিতা আমাকে বললেন, আমার ছেলে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। খুব ভালো লাগছে। আমেরিকায় পাঠিয়ে দিবো। উন্নত বিশ্ব থেকে লেখাপড়া করে সে প্রগতির উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবে। দেখলেন তো, এই বয়সেই জ্যাকসনের মতো কেমন নাচ দেখালো! আমেরিকা থেকে যখন ফিরে আসবে, তখন সে আরো কতো কিছু দেখাতে পারবে, তা ভেবে অনেক ভালো লাগছে।

সুতরাং তাকে আমেরিকায় পাঠানো হলো।

পাঁচ বছর পরের কথা। আমার সাথে ছেলেটির দেখা হলো। তার মুখে দাড়ি। আযান হলেই দৌড়ে মসজিদে গিয়ে নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ায়। ভাবলাম, এ কি? কি ভেবেছিলো আর কি হয়ে গেলো। ছেলেটির সাথে কথা বললাম। অনেক ক্ষণ ধরে আলাপ হলো। সে যা বললো,তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ আমেরিকায় গিয়ে বাঙালি সমাজে দু'ধরনের ছেলেদের গ্রুপ দেখতে পেলাম। একধরনের ছেলেরা নাচ গান আর নানা রকম আনন্দ ফূর্তিতে মেতে আছে। সেই ছেলেদের তেমন লেখা পড়া হচ্ছে না। ছেলে হয়েও কানে দুল দিয়ে ঘোরে। অন্য দিকে দেখতে পেলাম কিছু ছেলে লেখা পড়া করছে। শিক্ষিত হচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গ গ্রহণ করলাম। দেখলাম, তারা নামায পড়ে। আমিও নামায পড়তে শুরু করলাম। তাদের সাথে লেখাপড়া করলাম। ক্লাসে আমি ফাস্ট বয়।

একদিন আমি তার পিতামাতার সাথে কথা বললাম। বাংলাদেশে তাদের যে ছেলেটি রয়েছে সে মাইকেল জ্যাকসনের মতো নাচে, লেখাপড়া তেমন করে না। বাপ মায়ের কথাও শোনে না। আর এই ছেলেটি হয়েছে অন্য রকম। বাপ মা তাকে পেয়ে বড়ই খুশি।

তিন প্রজন্ম

একদিন আমি অফিসে বসে আছি। আমার একান্ত সচিব এসে বললো, এক বয়স্ক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। আমি আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি এলেন। তার সাথে আরেকজন মহিলা এবং একটি মেয়ে। বসতে বললাম।

তিনি হেসে বললেন, স্যার আপনি তো উপাচার্য, আর আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি কি করে আপনার সামনে চেয়ারে বসি।

আমিও হেসে বললাম, ছাত্র হবেন কেন, দেখেতো মনে হচ্ছে আপনি আমার একজন শিক্ষকের মতো।

তারা বসলেন। বললেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা এই তিনজন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। সেই ইতিহাসের শিরোপা আপনার।

বুঝতে পারলাম না। বললাম, খুলে বলুন।

তিনি বললেন, আমরা এখানে তিন প্রজন্মের মানুষ আছি। আমি এবং এই মহিলা হলো আমার মেয়ে। তারপরের মেয়েটি হলো তার মেয়ে। আমরা সবাই এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর নিবন্ধিত ছাত্রছাত্রী। এই তিন প্রজন্ম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছি।

আমি ধন্যবাদ দিলাম। ভাবলাম, শিক্ষার বয়স নেই। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শেখার সময়। আর বয়স যতো বাড়ে, শেখার যোগ্যতা ততই বৃদ্ধি পায়।

আমি বললাম, এই ইতিহাস সৃষ্টির শিরোপা তো আপনাদের। আপনার, আপনার মেয়ের এবং নাতনীর। এই শিরোপা আমার হবে কেন?

তিনি বললেন, আমি এই বয়সে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি লেখাপড়া করার জন্য। এই সুযোগ আর কেউ করে দেয়নি। আপনি করে দিয়েছেন। সেই জন্য শিরোপা আপনারই।

দাবি

অনেক সময় অফিস থেকে যেতে দেরি হয়ে যায়। দুপুর একটায় লাঞ্চ বিরতি। কিন্তু বিভিন্ন কাজে কখনো কখনো প্রায় তিনটা বেজে যায়। একদিন তেমনটি হলো। বেরিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটি ডিপার্টমেন্টের একজন পিয়ন এসে সামনে দাঁড়ালো।

সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের সাথে কথা বলতে পিয়নরা ইতস্তত বোধ করে। কিন্তু সে পিয়নটি আমাকে বললো, স্যার কথা আছে। ভাবলাম, তার চেয়ে অনেক বড় কর্মকর্তারাও ফোন করে আসে। এই পিয়ন ফোন করে তো এলোই না, আবার একটু দাবির সুরে বললো, স্যার কথা আছে।

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, তুমি কি আর সময় পেলে না? এ সময় এলে! আমি লাঞ্চে যাচ্ছি। বাজে তিনটা। আর বলছো, কথা আছে।

সে বললো, স্যার কথাটা একটু শুনুন, প্লিজ!

একটা পিয়নের মুখে এমন জোর মানায় না। কিন্তু তার মনের দাবি দেখে ভাবলাম, কথাটা শোনা দরকার। তাকে নিয়ে আবার অফিস কক্ষে ঢুকলাম। তার কথা শুনলাম। কথা শোনে তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

ভাবলাম, আপন হলেই দাবি চলে।

কি করে একটা সন্তান পাওয়া যায়

আমার এক আত্মীয়ের আত্মীয়া। আমি তাঁকে জানি এবং চিনি, কিন্তু তাঁর সাথে দেখাশুনা বড় একটা হয় না। কিন্তু এতোটুকু বুঝি যে, তিনি আমাকে ভালো জানেন। আমার প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। এক রাতে তার নিকট থেকে ফোন পেলাম। ফোন ধরেই শুনি করুণ কান্না।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

বললেন, আমার জীবনটাই মিছে। কোন মেয়ে যদি মা হতে না পারে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই। বললেন, আমি একটা বিষয় কারো সাথে শেয়ার করতে চাই, কিন্তু এমন নির্ভরযোগ্য কাউকে পাই না। আমার মনে হয়েছে আপনাকে বিশ্বাস করা যায়, বলা যায় সবকিছু, পরামর্শ করা যায়।

বললাম, আমি শুনতে পারি, কিন্তু কতটুকু উপকার করতে পারবো তা তো বলতে পারি না।

এরপর তিনি তার যৌবনের কিছু কাহিনী বললেন। যা বললেন, তার সারমর্ম হলো এই যে, তিনি অনেক আনন্দ করেছেন। বিয়ে হওয়ার পরও দশ বছর পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছেন। এরপর যখন সন্তান নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন তিনি গর্ভধারণ করতে পারেননি। তাঁর বয়স এখন পঞ্চান্ন। সন্তানের আর আশা নেই। তিনি তাঁর কথা শেয়ার করার মতো কাউকে পাচ্ছেন না।

সবশেষে তিনি বললেন, আমি যদি বিদেশে গিয়ে চেষ্টা করি ডাক্তার দেখাই, সন্তানের মুখ কি দেখতে পাবো?

ছাই লাগে ছাই

উত্তরায় থাকি। বাসা থেকে প্রায় সময় এক মহিলার কণ্ঠ শুনতে পাই: ছাই লাগে ছাই! একদিন আমার ড্রাইভার ইমাম হোসেনকে পাঠালাম বিষয়টি দেখার জন্য। সে এসে বললো, এই মহিলা ছাই বিক্রি করে। কাজেই সে চিৎকার করে মানুষকে জানান দেয়, কেউ ছাই কিনবে কি না।

পরের দিন আমি ইমাম হোসেনকে পাঠালাম সেই মহিলাকে নিয়ে আসতে। মহিলাকে বাসায় নিয়ে আসা হলো।

বললাম, তুমি মহিলা হয়ে পথে পথে ঘুরে ছাই বিক্রয় করছো। এতে তো তোমার অনেক কষ্ট হয়। তুমি বরং অন্য কোন সহজ ব্যবসা করতে পারো।

সে বললো, আমি বাসার পাশে পিঠা বানিয়ে বিক্রয় করতে পারি। কিন্তু সেজন্য তো পুঁজি প্রয়োজন হবে। সেই পুঁজি আমার নেই।

বললাম, কতো পুঁজি লাগবে?

আমি তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি দিয়ে দিলাম। বললাম, তুমি এখন থেকে বাসার পাশে পিঠা বিক্রয় করো। এভাবে কষ্ট করার দরকার নেই।

এর এক মাস পর আবার সেই একই কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'ছাই লাগে ছাই'!

ভিক্ষা ব্যবসা

ঢাকা শহরে ট্রাফিক লাইটে ভিক্ষুকরা ভীড় জমায়। আমাদের বাসার কাছের ট্রাফিক লাইটে একজন ভিক্ষুককে সবসময় হাত বাড়াতে দেখা যায়। সেদিনও সেখানে গাড়ি থামলো। সে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ালো। লোকটি ততো বৃদ্ধ নয়। কিছু কাজ করতে পারবে বলে মনে হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভিক্ষা না করে অন্য কোন কাজ করতে পারো?

সে বললো, আমি হয়তো কাঁচা বাজারে সবজি বিক্রয় করতে পারবো। কিন্তু তার জন্য প্রায় হাজার খানিক টাকা লাগবে।

বললাম, তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তুমি ভিক্ষা ছেড়ে কাঁচা বাজারে ব্যবসা করো।

সে সম্মতি দিলো। আমি তাকে টাকা দিলাম। এরপর তাকে অনেকদিন দেখলাম না। কিন্তু হঠাৎ করে আরেকদিন তাকে দেখা গেলো ভিক্ষা করতে। জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি তো টাকা নিয়েছিলে ব্যবসা করার জন্য এই শর্তে যে, ভিক্ষা করবে না।

সে বললো, ব্যবসার চেয়ে ভিক্ষা করেই বেশি পাওয়া যায়!

মনে হলো, ভিক্ষাবৃত্তিও একটি বড় ব্যবসা বটে।

ছাগল বানিয়ে ছাড়লো

ঘটনাটি আবু বকর সাহেবের নিকট শুনা। গ্রামের এক ব্যক্তি শহরে বেড়াতে এলো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে। অনেক আয়োজন করে খাবারের ব্যবস্থা করা হলো। সামনে ছিল লেটুসসহ সালাদের ডিশ। অতিথি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বললো, শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাগল বানিয়ে ছাড়লো।

ভাবলাম, যে যা জানে না সে তার কদর বুঝবে কি করে?

বড় হতে চাই না

বয়স কিভাবে কেটে গেলো বুঝতেই পারলাম না। এই সেদিনই তো ছোট ছিলাম। চোখের সামনে যেনো ভাসছে, খেলছি, দৌড়াদৌড়ি করছি, দুষ্টুমি করছি। সবই যেনো ছায়া হয়ে ঘুরছে, প্রামাণ্য চিত্রের মতো। ভাবছি, যদি বড় না হতাম, কতই না ভালো হতো।

শেষ বয়সে পাওয়া ছোট্ট ছেলে আনাস। একদিনের কথা। সে পাশেই বসে আছে মায়ের কোলে। সে মায়ের গলা ধরে বললো, মা আমি বড় হতে চাই না।

আশ্চর্য হয়ে ওর কথা শুনলাম। ভাবলাম, যখন ছোট ছিলাম তখন তো বিষয়টি এভাবে বুঝিনি!

হিংসায় পতন

আমাদের গ্রামের বাড়ির আঙ্গিনাটা বেশ বড়। তখন আমি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। আঙ্গিনায় একটু জায়গা তৈরি করে আমি কিছু ফুলের গাছ লাগালাম। কয়েক বাড়ি পেরিয়ে আরেকটা বাড়ি। সে বাড়ির সামনে একটা ছোট আঙ্গিনা। একদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে গিয়ে দেখি, সেই আঙ্গিনার ছোট একটু জায়গায় অনেকগুলো গাছ লাগানো আছে। গাছগুলো এতো ঘন করে লাগানো হয়েছে যে, চারা অবস্থায়ই একটা গাছ আরেকটা গাছের সাথে লেগে আছে। দেখলাম, ভালো লাগলো। কারণ, আমাদের সবার বাড়ির সামনে যদি গাছ লাগাই তাহলে আমরা অনেক ফল খেতে পারবো। ফুল পাবো। পরিবেশ রক্ষিত হবে।

একদিন আমার সমবয়সী এক ছেলে এসে আমাকে বললো, তুমি কি ঐ বাড়ির গাছগুলো দেখেছো?

আমি বললাম, দেখেছি।

সে বললো, তুমি কি দেখেছো কতগুলো গাছ লাগানো হয়েছে?

বললাম, দেখেছি। ভালোই তো!

সে বললো, ভালো তো বটে, কিন্তু কতো ঘন গাছ লাগিয়েছে, তা দেখেছো? এ হলো তোমার সাথে গাছ লাগাবার প্রতিযোগিতা। হিংসাও বলতে পারো। তুমি তোমার বাড়িতে যতো ফুলের চারা লাগিয়েছো, সে তার দ্বিগুণ লাগিয়েছে। তোমার চেয়ে উপরে থাকবে।

আমি বললাম, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা তো ভালো। দেশের ভালো হবে। দেশের উন্নতি হবে।

সে বললো, এতো ঘন গাছ তো বাঁচবে না, ফুলও হবে না।

আমার স্কুল শিক্ষকের একটা কথা মনে পড়ে গেলো : হিংসায় পতন।

মাজার

সেদিন ফোন পেলাম আমার দূর সম্পর্কের এক বোন থেকে। সে বললো, আপনার সাথে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আসতে চাই।

বললাম, আসো।

পরের দিনই সে আসে। বলে, আমি আমার ছেলের জন্য এক মাজারে যাওয়ার মানত করেছি। কিন্তু সেই ছেলে মাজারে যেতে চাচ্ছে না। এখন আমি কি করবো?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাজারে যাওয়ার জন্য কেন মানত করেছো?

সে বললো, অনেকেই তো মানত করে মাজারে যায়। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য। আমিও তাই করেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাজারে যে ব্যক্তি শায়িত আছেন, তিনি তো মৃত। দুনিয়াতে তার কিছু করার ক্ষমতা নেই। আর বাকী রইলো আল্লাহর নিকট থেকে কিছু এনে দেওয়া। এখন প্রশ্ন, তিনি আল্লাহর নিকট কতটুকু পছন্দনীয় তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? তিনি যে বেহেশতে যাবেন, তাও কি নিশ্চিত করে বলা যায় ? যদি তা বলা না যায়, তা হলে তিনি এই মৃত অবস্থায় আল্লাহর নিকট থেকে আমাদের জন্য কি এনে দিতে পারেন ?

বোনটি বললো, তাই তো!

কোক

লোকটি আমার পরিচিত। থাকে ওয়াশিংটনে। মুখের রুচি অনেক ভালো। প্রচুর খায়। আর সেই অনুপাতেই দেহের আকার। বাজার থেকে কেনা শার্ট গায়ে লাগে না। প্যান্টও লাগে না। বরং দর্জি দিয়ে বানাতে হয়। তার বিশেষ পছন্দের পানীয় হলো কোকা কোলা। বোতলের পর বোতল চলে। একদিন তার বাসায় গল্প হচ্ছে। আর কোকও চলছে। তখন এক বন্ধু তাকে বললো, তুমি তো এমনি অনেকটা মোটা হয়ে গেছো, এতো বেশি কোক খেয়ো না। কারণ কোকে প্রচুর চিনি আছে। আর চিনিগুলো দেহে চর্বি তৈরি করে।

পাশেই বসা ছিল তার ছেলে। তাকে সে একটু অভিমানের সুরেই বললো, শুনো, অনেক মানুষ তার বাপের কবরে ফুল দেয়। তুমি যদি আমার কবরে কিছু দিতে চাও তা হলে একটা কোকের ক্যান নিয়ে যেয়ো।

আমার কবরে ফুল চাই না। কোক চাই।

একটা শেষ করে নেই

আমার পিএইচ.ডি সুপারভাইজার ছিলেন প্রফেসর র‍্যালফ্ হ্যারিস। তিনি ব্রিটিশ কেনেডিয়ান। একদিন তার সাথে খাবার-দাবার নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। তিনি বাঙালিদের খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। উত্তর দিলাম। এরপর বাঙালি খাবার খেয়ে দেখার জন্য তাঁকে আমি আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি আনন্দের সাথে রাজি হলেন।

বাসায় রান্না-বান্না হলো। তিনি এলেন। তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। সাদা ভাত, পোলাও, কোরমা, মাছ, শাক-সবজি ইত্যাদি। তিনি সাদা ভাত প্রথম নিলেন। নিয়ে চামচ দিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। আমি বললাম, এর সাথে একটু তরকারি নিয়ে নিন। এখানে বেশ কয়েকটি তরকারি আছে। যেটা ভালো লাগে নিন।

তিনি বললেন, একটা শেষ করে নেই। পরে তো আরেকটা নিবো।

বললাম, আমাদের নিয়মে শুধু ভাত খাওয়া হয় না। বরং তার সাথে তরকারিও নেয়া হয়।

তিনি বললেন, যখন কাজ করো, একটা একটা করে করো। একসাথে দুটো করলে কোনোটাই ঠিক মতো হবে না। খাবার সময়ও তাই। একটা খাও। পরে আরেকটা খাও। দুটো এক সাথে খেতে চাইলে কোনোটারই স্বাদ পাবে না।

ভাবলাম, উপদেশটা তো বেশ দামী।

জীবনের ট্রেন একটাই

এক মেধাবী যুবতি মেয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষে শিক্ষক হিসেবে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে। তার বাপ-মা বার বার বিয়ের কথা বলেন। মেয়ে বলে, বিয়ের চেয়ে পেশা বড়। আগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিই।

অধ্যাপনা পেশায় পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রয়োজন। এই পিএইচ.ডি ডিগ্রিতে ছয় বছর কেটে গেলো। পদোন্নতির জন্য দুটি গবেষণা ও প্রকাশনায় গেলো আরো দু'বছর। প্রতিষ্ঠা মোটামুটি হলো। এবার বিয়ের পালা। কিন্তু এতো যোগ্যতার ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। কম যোগ্যতার ছেলেকে গ্রহণ করতেও সে রাজি নয়। সমাজে মুখ দেখাবে কি করে? এভাবে বছরের পর বছর কেটে গেলো।

এখন তার বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। তার আর পরিবার হলো না। সেদিন তার পিতাও মারা গেছেন।

জীবনের ট্রেন একটাই।

কী লাভ এতো কিছু করে

আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক রাত দিন কাজ করেন। ব্যবসা বাণিজ্য অনেক। টাকা পয়সা বেহিসাব। তার ছেলের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি। বন্ধুর মতো।

একদিন হঠাৎ আমার বন্ধুর ফোন পেলাম। তার পিতা মারা গেছেন। আমাকে সে অনুরোধ করলো যেনো তাদের বাড়িতে একবার যাই। গেলাম। বাড়ি পৌঁছার কিছুক্ষণ আগে ফোন দিলাম যে, কয়েক মিনিটের মধ্যে আমার পৌঁছার কথা। সে বাইরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই সে জড়িয়ে ধরলো এবং চোখের জলে বললো, এতো কিছু করে কি লাভ! সব কিছু ছেড়েই তো চলে যেতে হয়!

শিক্ষকতার আনন্দ

সেদিন আমি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য শেষ করলাম প্রধান অতিথি হিসেবে। যখন ডায়াস থেকে নিচে নেমে গেলাম, তখন একজন প্রবন্ধ উপস্থাপিকা আমার কাছে মোটামুটি দৌড়েই এলেন। বললেন, স্যার! আপনি তো আগের মতই আছেন। আপনার বক্তব্য খুবই ভালো হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কাজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন, স্যার আপনি আমাকে হয়তো চিনতে পারেননি। আমি আপনার স্টুডেন্ট ছিলাম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। এখন আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। সেখান থেকে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি।

অত্যন্ত ভালো লাগলো। মনে শান্তি পেলাম, আমার একজন ছাত্রী এখন একজন স্কলার হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছে। এটাই তো শিক্ষকতার সার্থকতা। শিক্ষকতার আনন্দ।

ইচ্ছে শক্তি

আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে আছি, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে। দেখলাম, সামনের সারিতে একটি মেয়ে বসে আছে। তার উচ্চতা একজন সাধারণ ছাত্রীর উচ্চতার অর্ধেক। আমি কৌতূহলে বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, সে কি সত্যিই নতুন কোন শিক্ষার্থী। নাকি এমনি এই নবীন বরণ অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য এসেছে।

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমি স্টেজ থেকে নিচে নেমে গেলাম। মেয়েটির কাছে গিয়ে বসলাম। তার সাথে কথা বললাম। আকারে খাটো হলেও কথা বলতে অসুবিধে নেই। সুন্দর কথা বলতে পারে মেয়েটি।

সে বললো, আমার বাবা মার সন্তানদের মধ্যে একমাত্র আমিই দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী। আমি অনেক খাটো। কিন্তু আমি ভেবেছি আমি জীবনে হার মানবো না। লেখাপড়া করেছি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে পাশ করেছি। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। আমি লেখা পড়া করতে চাই। শিক্ষিত হতে চাই। বড় হতে চাই।

অত্যন্ত ভালো লাগলো। সে ব্যতীত শুধু অন্যান্য নবীন ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে যতটুকু ভালো লাগতো তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগলো। ভালো লাগলো তার মানসিক শক্তি দেখে, প্রত্যয় দেখে। বললাম, তুমি লেখাপড়া চালিয়ে যাও, তুমি অনেক বড় হতে পারবে। কখনো কোন প্রয়োজন হলে, আমার সাথে যোগাযোগ করো।

সে বললো, আমি কি আপনার সাথে একটা ছবি উঠাতে পারি। আমি সানন্দে সায় দিলাম। ছবি উঠানো হলো। বললাম, তোমাকে চায়ের আমন্ত্রণ দিচ্ছি। যখনই পারো, এসো। আমার সাথে বসে চা খাবে।

ইচ্ছে শক্তিই তো চালিকা শক্তি!

গরু বানিয়ে ছাড়লেন

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির করিডোরে হেঁটে যাচ্ছি। সাথে ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ও আরো কয়েকজন। কাজী সাহেবই সবার মুরব্বী। আমি তাঁকে সবার সামনে যাওয়ার ইঙ্গিত করলাম।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, আমাকে একেবারে গরু বানিয়ে ছাড়লেন!

মজাই হলো। হাসলো সবাই। গরু হাঁকিয়ে নেওয়ার সময় তো রাখাল গরুকে সামনেই রাখে। তবে সামনের সবাই গরু নয়, আর সব গরুই গরু নয়।

চলার পথে একটু হাসলে মন্দ কি!

মতি মসজিদ

ভারতের লাল কেল্লায় ছোট্ট একটি মসজিদ। দেখতে মনে হচ্ছে মূল্যবান পাথরের তৈরি। আসলে তা ছিল মতি দিয়ে তৈরি। সেই জন্যই এর নাম মতি মসজিদ।

গাইড বললো, এখানেই বসে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইবাদত করতেন। নামায পড়তেন। সে আরো বললো, তিনি নিজ হাতে কুরআন লিখতেন এবং টুপি সেলাই করতেন। আর তা বিক্রয় করে যে পয়সা আসতো তাই তিনি নিজের জন্য খরচ করতেন। রাজকোষ থেকে পয়সা নিতেন না।

এই ধরনের কথা আমি বই পত্রে পড়েছি। কিন্তু দিল্লির স্থানীয় একজন গাইডের মুখে তা শুনে যেনো নতুনভাবে জানা হলো।

মানুষ মরে গিয়েও বাঁচতে পারে।

মনে ধনী

আমি একজন মহিলাকে জানি, ঢাকা শহরে যার দুটি এপার্টমেন্ট আছে। আসলে এটি কিন্তু বিরাট ব্যাপার। উন্নত দেশগুলোতে শহরে বাড়ি কেনা ততো কঠিন নয়। কারণ ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যায়, অফিস থেকে ঋণ পাওয়া যায়। যে কোন অবস্থানের মানুষ হয়েও একটি বাড়ি বা এপার্টমেন্টের মালিক হওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ঢাকা শহরে এটি বিরাট ব্যাপার। প্রচুর ধন সম্পদের মালিক না হলে ঢাকা শহরে কোন বাড়ির স্বপ্ন দেখা যায় না। প্রচুর অর্থ না থাকলে এপার্টমেন্টেরও মালিক হওয়া যায় না।

কিন্তু দুটি এপার্টমেন্টের মালিক হয়েও সে মহিলা মনে করেন তার অবস্থা ততো ভালো নয়। আরো দরকার। কাজেই দেখা যায়, তিনি এদিকে হাত দেন, ব্যর্থ হলে আরেক দিকে হাত দেন। আমি যতটুকু জানি, একবার তিনি জমি-জমা বেচা কেনার ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যর্থ হলেন। আরো অনেক কিছু করার পর শেষ পর্যন্ত বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির কাজ শুরু করলেন। ধরা খেলেন। যাদের থেকে টাকা এনে বিদেশী এজেন্সিগুলোকে টাকা দিয়েছেন তারা সবকিছু মেরে দিয়েছে। এখন তার হাত শূন্য।

ভাবলাম, যার যতই থাকুক, মনে যদি তৃপ্তি না থাকে তা হলে সে গরিব। আর কেউ যদি অল্পে তুষ্ট থাকে তা হলে সে ধনী।

মনের ধনীই ধনী।

প্রেম

প্রেমের নয়ন অন্ধ। এই কথা সবাই বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রেমের নয়ন অন্ধ নয় বরং সুন্দর। প্রেমের নয়ন প্রেমিকের মধ্যে সবকিছু সুন্দর দেখতে পায়। কোন দোষ ত্রুটি বা দুর্বলতা চোখে পড়ে না।

এক অধ্যাপকের মেয়ে ভালোবাসে তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে। ছেলেটি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। এর উপরে যেতে পারেনি। মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী। প্রায় সমবয়সী হলেও সে একের পর এক লেখাপড়া করে চলেছে। স্নাতক শেষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করেছে সাফল্যের সাথে। সে বায়না ধরেছে এই ছেলেটিকেই সে বিয়ে করবে,অন্য কাউকে নয়। মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাকে অনেক বুঝালো। কিন্তু জবাব একটাই, 'আমি তাকে ভালোবাসি।' শেষ পর্যন্ত মা-বাপ রাজি হলেন। বিয়ে হলো। মেয়েটি মালয়েশিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি করতে গেলো। যাওয়ার আগেই বিয়ের কাজ শেষ হলো।

মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করে উপার্জন করছে এবং পিএইচ.ডি করছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা স্বামী ঘরে বসে সময় কাটায় আনন্দে, টেলিভিশন দেখে। এক সময় মেয়েটির পিএইচ.ডি শেষ হলো। তাদের জীবন বেশ সুখেই কাটছে। তাদের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে অথবা মনস্তাত্ত্বিক কোন কিছু হয়েছে বলে শুনিনি।

প্রেম আত্মিক, শান্তি ও আত্মিক, আত্মায় আত্মায় মিলন হলে শান্তির পথে কিছুই বাধা হতে পারে না।

প্রেম যেখানে বস্তুতান্ত্রিক, সমস্যা সেখানেই।

শশুর বাড়ি

তখন আমি ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। একদিন প্রতিবেশী এক লোক তার স্ত্রীকে ছোট্ট একটি ঘটনায় তালাক দিয়ে দেয়। সেই মহিলাটির দুই সন্তান। গরীব হওয়ার কারণে সারা দিন-রাত সে অনেক কষ্ট করতো। কিন্তু একটি তুচ্ছ ঘটনায় তালাক দেওয়ার কারণে তার যে কি কান্না। দেখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণে তাকে শুধু স্বামীর বাড়ি ছেড়েই চলে যেতে হবে না, বরং তার হৃদয়ের টুকরো ছোট্ট দুটি সন্তানকেও রেখে যেতে হবে। এটাই সামাজিক নিয়ম। কাজেই তাই হলো।

এর বছর খানেক পরে আমাদের প্রতিবেশী এক চাচাতো ভাই সে মহিলার বাপের বাড়ির নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সেই মহিলাটি তাকে দেখে দৌড়ে তার কাছে এলো। তার দিকে তাকিয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলো, তার স্বামী কেমন আছে। তার সন্তান দুটো কেমন আছে। সে আরো দুই একজন মহিলাকে ডেকে ডেকে বললো, এই দেখো আমার শশুর বাড়ির একজন লোক পেয়েছি।

ভাবলাম, হৃদয়ের অনেক ধরন আছে। কোন হৃদয় পাষাণ, আর কোন কোন হৃদয় হৃদয়ের মতো।

দাদা

কুয়ালালামপুরের বাসায় নাস্তার টেবিলে New Straits Times পত্রিকার দিকে নজর বুলাচ্ছি। একটি সংবাদের প্রতি নজর পড়লো। 'দাদা' বহনের অপরাধে এক আমেরিকান নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। নিজ দেশের নাগরিকের প্রাণ রক্ষার জন্য আমেরিকা বেশ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। ভাবলাম, মালয়েশিয়ার বুকের পাটা আছে।

কিন্তু সেটা কথা নয়। কথা আরেকটা। যে দাদাকে আমরা এতো সম্মান করি, সে দাদার জন্য মৃত্যুদণ্ড! মালয়েশিয়ানদের দাদা (dadah) হলো নেশা সামগ্রী। যেমন, গাঁজা। এ গাঁজা বহনের জন্যই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হলো।

কি বিচিত্র মানুষের বুলি!

ইতি

পড়াশুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থাকি হলে। বন্ধু বান্ধব অনেক। তার মধ্যে দু'একজন ঘনিষ্ঠ। আমরা ডাইনিং হলে খাওয়া-দাওয়া করি। সে বন্ধুটি খাবার দাবার নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক। গরুর গোশত খায় না। খাসির গোশত খায় না। ঝাল চলবে না। শাক সবজি থাকলে ভালো, না হলে ডাল। কর্মজীবনেও তাই। অত্যন্ত সতর্ক। আমাকে একদিন বললো, কখনো গরুর মাংস খাবে না। এমনকি একটু ঝোলও নিবে না। অফিসের ফাঁকে সে বাইরে নাস্তা খায় না। চিড়া ভাজি করে অফিসে রাখে। ক্ষুধা লাগলে একটু মুখে দেয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ভালো।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, সে অসুস্থ। চেতনা নেই। দৌড়ে গেলাম হসপিটালে। দেখলাম মরার মতো পড়ে আছে। কিছুই করার ছিল না। তার স্ত্রী এবং সন্তানকে সান্ত্বনা দিলাম। চার দিন পর খবর পেলাম সে চলে গেছে না ফেরার দেশে। আর কখনো ফিরে আসবে না।

ভাবলাম, মানুষ যতই চেষ্টা করুক তার জীবনের সরল রেখার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। জীবনের ইতি আছে। যতো চেষ্টাই করা হোক তার বাইরে যাওয়া যাবে না। সবকিছুতেই সতর্ক থাকলে জীবনের ইতি পর্যন্ত ভালো থাকা যায়, কিন্তু ইতির ইতি নেই।

সেই ইতির প্রতি খেয়াল না রেখে এতো ব্যস্ত হয়ে লাভ কি?

ট্রাফিক লাইটের ফুল

গাড়ি দাঁড়ালো ট্রাফিক লাইটে। একটি ছোট্ট মেয়ে গাড়ির জানালার পাশে এসে বললো, স্যার, আমার কাছে কয়েকটি ফুল আছে। আপনি *নিয়ে জান না, স্যার। আমি যদি এই কয়টা ফুল বিক্রি করতে না পারি,* তা হলে আমার পুঁজির পয়সাটাও নষ্ট হবে। আমাকে মা বকা দিবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন ফুল বিক্রি করো?

বললো, আমার মা বাসা-বাড়িতে কাজ করে। তা দিয়ে সংসার চলে না। আমি লেখাপড়া করতে চাই। এই ফুল বেচে আমার খরচ চালাই।

বললাম, এই কয়টি ফুলের দাম কতো?

বললো, পঁচিশ টাকা।

আমি বললাম, দাও ফুলগুলো। তাকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিলাম।

সে বললো, আমার কাছে ভাংতি নেই।

বললাম, ভাংতি লাগবে না। পুরোটাই নিয়ে যাও।

সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

বান্ধবীর সাথে রাত

ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবায় অফিসে বসে আছি। আমি পিএইচ.ডি গবেষক। আমার ঘনিষ্ট বন্ধু হলো গ্যারি সচুক। সাদা রঙের ছেলে।

গ্যারির মাও জানতো আমি তার ছেলের ঘনিষ্ট বন্ধু। একদিন তিনি ইউনিভার্সিটির অফিসে এলেন। বললেন, তোমার সাথে একটা কথা আছে গ্যারির ব্যাপারে। সে এখনো বান্ধবীর সাথে রাত কাটায় না। এ ব্যাপারে আমি চিন্তিত। যদি দৈহিক অপারগতার কারণে এমন হয়ে থাকে, তা হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। আর যদি এমন হয় যে, লজ্জার কারণে গ্যারি কোন মেয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারছে না, তা হলে আমি তাকে মেয়ে যোগাড় করে দেবো। বন্ধু হিসেবে তুমি বিষয়টি জানতে চেষ্টা করো। এরপর আমাকে বলো।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, আমাকে এতো আপন মনে করে একান্তে এ কথা শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ। আমি চেষ্টা করবো এ কাজটি করতে।

এরপর আমি কৌশলে গ্যারির নিকট থেকে বিষয়টি জানতে চেষ্টা করলাম। সে বললো, তার একটি নয় বরং একাধিক বান্ধবী আছে। তাদের সাথে রীতিমতো মিলন হয়। যদিও বাইরে গিয়ে তাদের একসাথে রাত কাটানো হয় না।

আমি গ্যারির মাকে ফোন করলাম। ফোনে বলতে চাইলাম। কিন্তু তিনি এতো উৎসাহিত যে, তিনি নিজেই চলে এলেন। বললাম, তার কোন সমস্যা নেই। বরং তার বান্ধবী আছে। সবই হয়।

মা খুব খুশী।

ওয়াদি জিন

মদিনায় অনেক দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান আছে। সেগুলো দেখাবার জন্য টুর গাইড আছে, যারা সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখায় এবং ইতিহাস বর্ণনা করে। আমি, আনাস ও তার মা গাইড নিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সব শেষে গাইড আমাদেরকে এক পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে গেলো। মদিনা শহর থেকে বেশ দূরে। সেখানে গিয়ে রাস্তায় নামলাম। দেখলাম আরো অনেক পর্যটক সেখানে জড়ো হয়েছে। সেই রাস্তাটি উপরের দিকে গেছে বেশ খাড়া হয়ে। গাইড একটা বোতল ভর্তি পানি নিলো। এরপর রাস্তায় সেই বোতলটি রেখে দিলো। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেই পানি ভর্তি বোতলটি নিচের দিকে না গিয়ে উপরের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। শুধু আমরাই না, বরং আরো কয়েকজনকে এরূপ কিছু করতে দেখলাম। যা রাস্তায় রাখলে নিচের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার কথা তা উপরের দিকে যায়। এরপর আমরা গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি স্টার্ট দেয়া হলো। কিন্তু এক্সিলেটারের চাপ ছাড়াই গাড়ি উপরের দিকে যাচ্ছে। গতি বেড়ে ঘণ্টায় ষাট থেকে আশি কিলোমিটারে যাচ্ছে। আর নিজে নিজেই তা হচ্ছে, এক্সিলেটরে চাপ ছাড়াই।

রাস্তাটির দুদিকেই বড় বড় পাহাড়। কেউ কেউ এমন মন্তব্য করছে, এই দুদিকের পাহাড়ে কি জিন থাকে, যারা গাড়িকে উপরের দিকে নিয়ে যায়, চালানো ছাড়াই। অথবা যা-ই পথে রেখে দেয়া হয় তা উপরের দিকে গড়িয়ে যায়।

স্থানটির নাম হলো ওয়াদি জিন।

ছোট্ট মেয়ের প্রজেক্ট

ওয়াশিংটনে এক বন্ধুর বাসায় এক পার্টিতে আছি। গল্প সল্প হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। হচ্ছে আনন্দ, উল্লাস। এর মধ্যে দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট মেয়ে একটু দূরে বসে কিছু লিখছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করছো?

সে বলল, আমি প্রজেক্টের কাজ করছি।

বললাম, তোমার কিসের এই প্রজেক্ট?

সে বললো, আমি বাংলাদেশের কৃষির উপর প্রজেক্ট লিখছি।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় পড়ো?

বললো, স্কুলে পড়ি।

আশ্চর্য হলাম, স্কুলের এক ছোট্ট মেয়ে কি প্রজেক্ট লিখবে!

সে বললো, তার শিক্ষক তাকে এ প্রজেক্ট লিখতে বলেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে কি জানো?

সে বললো, আমি কিছুই জানি না। বললাম, তা হলে কিভাবে লিখবে?

বললো, আমি আমার স্যারকে এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের কৃষির উপর বই পাওয়া যাবে। বললাম, আমি তো সেই বই খুঁজে পাবো না। তখন তিনি আমাকে লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। কিভাবে বই বের করতে হয় শেখালেন। আমি বই খুঁজে বের করলাম। এরপর বললেন,তুমি বাড়ি যাও। বইটা খুলে খুলে দেখ। বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাও তা একটা পৃষ্ঠায় লিখে নিয়ে আসো। এটাই আমার প্রজেক্ট।

ভাবলাম, এটাই তো সৃজনশীল শিক্ষা। বই মুখস্থ না করিয়ে যদি কিছু চিন্তা করার শিক্ষা দেয়া হয় এবং নিজের ভাষায় নিজের মতো করে কিছু লিখতে উৎসাহিত করা হয়, তা হলে ছাত্রছাত্রীরা সৃজনশীল হতে পারে।

কাসাব্লাঙ্কা

মরক্কোতে ওআইসি'র তথ্য কেন্দ্র। একটা গবেষণার কাজে গেলাম সেখানে। এক বিকেলে একটু সময় কাটাতে কাসাব্লাঙ্কা সমুদ্র সৈকতে গেলাম। সেখানে লক্ষ্য করলাম উদগ্রীব নারীর চাহনি। একটু পর পরই হয়তো কোন মেয়ে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেনো চোখে চোখে কথা বলছে। একটু পর দেখতে পেলাম একটি দামী গাড়িতে একটি মহিলা বসে আছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার চোখেও দেখতে পেলাম কামনার চাহনি।

কিছুদূর গিয়ে আমার মরক্কোবাসী সঙ্গীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এই কাসাব্লাঙ্কায় পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি। তারা পুরুষের একটু সঙ্গ চায়। আনন্দের জন্য। যেহেতু একজন পুরুষ শুধু একটি মেয়েকেই বিয়ে করে, সেহেতু অনেক মেয়ে অবিবাহিত থেকে যায়।

তিনি আরো বললেন, এ কারণে এখানকার অনেক নারীই বহুবিবাহের পক্ষে আন্দোলন শুরু করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি এখনো।

উপপত্নী

সেদিন একটি ফোন পেলাম। ফোনটি ধরলাম। অপর পারে নারী কণ্ঠ। আমি ফোন ধরার সাথে সাথে কান্না জড়িত করুণ কণ্ঠে সে বলতে লাগলো, স্যার, আমি আপনাকে ফোন করার জন্য দুঃখিত। ক্ষমা চাই। আমি অনেক বিপদে আছি। আমি শুনেছি আপনি বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন। হয়তো আমাকেও একটু সাহায্য করতে পারেন। এই জন্যই ফোন করা।

বললাম, কি ব্যাপার?

সে বললো, আমার ছোট একটা সংসার ছিল। এক ছেলে। বয়স দুই বছর। কিন্তু স্বামীর আর্থিক অবস্থা ততো ভালো নয়। একদিন অন্য এক ভদ্র লোকের সাথে পরিচয়। আমাকে এক ভালো রেস্তোরায় নিয়ে খাওয়ালেন। মূল্যবান গিফ্‌ট কিনে দিলেন। এই ভাবেই আমাদের পরিচয় চলতে থাকে। ফোনালাপ প্রচুর হয়। অনেক গিফ্‌ট পাই। মেলামেশা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে বলেন, আমি যদি ছেলে ও স্বামী রেখে চলে আসি তা হলে তিনি আমাকে একটা এ্যাপার্টম্যান্ট কিনে দিবেন। সেখানে থাকবো। এবং সারাজীবন স্ত্রীর মতোই রাখবেন। তবে সামাজিক ভাবে নয়। গোপনে।

মেয়েটি আরো বলে চললো, ভাবলাম এতো টানাটানির সংসারে যদি একটু ভালো থাকতে পারি। আর আনন্দের জীবন হলে মন্দ কি। সুতরাং আমি আমার স্বামী ও সন্তান ছেড়ে একদিন চলে এলাম। অনেক খারাপ লাগলো। কিন্তু ভবিষ্যতের শান্তির জীবনের আশায় এই ব্যাথাটুকু সহ্য করলাম। তিনি আমাকে একটা বাসা করে দিলেন। খুব আনন্দে দুটি বছর কেটে গেছে। কিন্তু এখন আর তাকে দেখতে পাই না।

আমি বললাম, এই ব্যাপারে আমি কি করতে পারি? মেয়েটি বললো, আমি শুনতে পেয়েছি আপনি মানুষের বিপদে সাহায্য করেন। আপনার অবস্থান থেকে যদি তাকে বলেন, তা হলে হয়তো তিনি আমাকে ফেলে দেবেন না।

ভাবলাম, আমরা যদি নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকি তা হলে তার চেয়ে শান্তির আর কিছু নেই।

বিয়ে বার্ষিকী

ছেলে হলে মেয়ের দিকে আকর্ষণ, আর মেয়ে হলে ছেলের দিকে আকর্ষণ এটাই স্বাভাবিক।

পশ্চিমা উদার সমাজে উঠতি বয়সেই সে সম্পর্ক শুরু হয়। যখন একজন পুরানো হয়ে যায় তখন আরেকজন গ্রহণ করা হয়। এভাবে বিয়ে করার বয়স পর্যন্ত পনের বিশ জনের সাথে সম্পর্ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অবশেষে যদি বিয়ে হয় তা হলে কিছুদিনের জন্য স্বামী স্ত্রীতে ভালোই সম্পর্ক চলে। কিন্তু ছেলেটি যখন সকালে অফিসে যায়, সেখানে তার সাথে থাকে অফিসের সহকর্মী অনেক নারী। অপর দিকে স্ত্রী যখন অফিসে যায়, তখন সে অন্যান্য পুরুষের সাথে অবস্থান করে।

অর্থাৎ সারাদিন স্বামী কাটায় অন্য নারীর সাথে, স্ত্রী কাটায় অন্য পুরুষের সাথে। এরপর দুজনেই যখন অফিস শেষে বাসায় যায়, তখন ক্লান্তিতে দুজনেই শুয়ে পড়ে। সকালে যখন রাতের নিদ্রার পর ফ্রেশ হয়ে উঠে, মনে প্রফুল্লতা থাকে, তখন স্বামী যায় অন্য নারীর কাছে, আর স্ত্রী যায় অন্য পুরুষের কাছে। এভাবে স্বামী-স্ত্রীতে প্রেম-প্রীতি- ভালবাসা ও মাখামাখির সুযোগই হয় না। তা হয় সারাদিন অন্য নারী ও অন্য পুরুষের সাথে। ফলে যে আকর্ষণে হলো বিয়ে তা দিনে দিনে বিকর্ষণে পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত দু'জন দু'জনের পথ দেখে, আরেকজনের হাত ধরে। এটাই যেনো স্বাভাবিক।

এ অবস্থায়ও কোন বিয়ে যদি পাঁচ বছর টিকে যায়, তখন তারা অত্যন্ত ঘটা করে বিয়ে বার্ষিকী পালন করে এবং অহংকারে সাথে বলে তাদের বিয়ে পাঁচ বছর টিকে গেছে।

এমন এক বিয়ে বার্ষিকীতে যোগ দিলাম সেদিন। নিউইয়র্কের এক দামী হোটেলে। এক বন্ধুর বিয়ে বার্ষিকী। বিরাট আয়োজন। তারা দু'জন মেহমানদের সামনে দাঁড়ালো। আনন্দে আবেগে তাঁদের চোখে জল!

বিয়ের পর পাঁচটি বছর এক সাথে কাটিয়েছে। একি চারটিখানি কথা!

সাদা বউ

আমি উইনিপেগে গিয়ে দেখি, একবছর পূর্বেই আরেক বাঙালি ভাই সেখানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি করছেন। কিছু দিনের মধ্যেই মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হলো। তিনি এক সময় বললেন, তিনি দেশে এক শিশু সন্তান ও স্ত্রী রেখে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ভালো। স্ত্রী তাঁর এতো যত্ন নেন যে, বাইরে যাওয়ার সময় পায়ে জুতাও পরিয়ে দেন।

তিন বছর পরের কথা। একদিন সেই ভাই বললেন, একটি কথা বলা হয়নি। আমি এখানে বিয়ে করেছি। সাদা ইংরেজ মেয়ে। এ কথা বলে তিনি তাঁর বাসায় দাওয়াত দিলেন। গেলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প হচ্ছে। নতুন সাদা ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, বাঙালি ভাইয়ের সাথে নতুন জীবন কেমন লাগছে?

তিনি জবাব দিলেন, নতুন কেনো? দু'বছর যেমন কাটলো তেমনি।

এরপর বাঙালি ভাইটির দিকে তাকিয়ে সাদা ভাবী মৃদু ভাবেই বললেন, গল্প তো হচ্ছে, কিন্তু ময়লা থালা-বাসনগুলো?

ভাইটি বললেন, এই যাচ্ছি।

আমাদের জীবনকথাই সাহিত্যের উপজীব্য। সে কথার বহু রূপ। তার কোনটি গল্প, কোনটি কবিতা, কোনটি অন্য কিছু। কিন্তু প্রত্যেকটির একেকটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো আছে। এ কাঠামোগুলোর কোনটি কখন শুরু হয়েছিল, তা জানা নেই। কিন্তু কেউ তো তা শুরু করেছিলেন। অথবা কালের বিবর্তনে ধাপে ধাপে তা বর্তমান কাঠামোতে এসে পৌছেছে।

এই বইটিতে নতুন কিছু পেলাম। এগুলো প্রতিষ্ঠিত ধারার কিছু নয়। কিন্তু পড়তে ভালো লাগলো। সাহিত্যের মাধ্যমে আনন্দ দেয়া তো কথামালার কাজ। তা তো হলো। তবে শুধু তাই নয়। লেখক দেশ বিদেশে ঘুরেছেন সারা জীবন। তার বাস্তবভিত্তিক টুকরো টুকরো লেখাগুলোতে চিত্রায়িত হয়েছে দেশ বিদেশের বিচিত্র মানুষের বিচিত্র জীবন গাঁথা, সমাজচিত্র, সুখ-দুঃখের কাহিনী। 'যেতে যেতে পথে পথে' বইটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসূত হলেও লেখক যে সকল মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদেরকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যেন এক একটি অনুগল্পের সমাহার! 'যেতে যেতে পথে পথে' বইটি পাঠে পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে কিংবদন্তি সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের 'পায়ের তলায় খড়ম' কিংবা বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পায়ের নিচে সর্ষে' ভ্রমণসাহিত্যের কথা! যদিও অনুগল্পের স্টাইলে লেখা এই ভ্রমণকাহিনিতে লেখক যে বিভিন্ন খণ্ডচিত্র মানবিক দরদ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলি ভিন্ন দ্যুতিতে উদ্ভাসিত।

এতে আছে আনন্দ, অনুভূতি ও হৃদয় ছুয়ে যাওয়ার মতো কিছু। আছে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আর তার বিচিত্র ফুল, ফল, ফসল।

আবু রাইহান

আবু রাইহান

কথা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক (কলকাতা)